বিনয়-বাদল-দীনেশ

শৈলেশ দে

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বিনয়-বাদল-দীনেশ

বিপ্লবী নায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

ও

অগ্নিযুগের অগ্নি-কন্যা শ্রীমতী উজ্জলা রক্ষিত রায়

করকমলেষু

যে সমস্ত বই থেকে সাহায্য নিয়েছি ঃ

১। সবার অলক্ষ্যে—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

২। বিপ্লব তীর্থে—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাসগুপ্ত

৪। বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ

৫। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

৬। ইতিহাস কই—নিকুঞ্জ সেন

ও

অন্যান্য অনেক বই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
লেখকের অন্যান্য বই :

আমি সুভাষ বলছি

ক্ষমা নেই

রক্ত দিয়ে গড়া

গ্রন্থকার তাঁর এই পুস্তকের (**বিনয়-বাদল-দীনেশ**) একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন বটে, কিন্তু **বিনয়-বাদল-দীনেশ** এবং এঁদের স্ব-গোত্র বিপ্লবী-কুলতিলক শহীদদের পরিচয় করিয়ে দিতে স্বতঃই আমি কুণ্ঠিত হই। এঁদের পরিচয় যে এঁরাই দিয়ে গেছেন,—বাক্য দিয়ে নয়, নিজেদের আচরণে। তাই কথা গেঁথে গেঁথে এঁদের নিয়ে লেখা পুস্তকের ভূমিকা লিখতে আমি সঙ্কুচিত হই। তৎসত্ত্বেও এঁদেরই নাম নিয়ে এই অনুরোধ মাথা পেতে না নিয়েও পারলাম না।

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময় :—

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!'

কবিগুরু বিশ্বের পরম সত্যান্বেষী যাঁদের কথা স্মরণ করেছেন এ গানে, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারি। কৃষ্ণপ্রেম, ভগবৎপ্রেম যেমন সত্য, দেশপ্রেম তেমনি সত্য। এই সত্যের অনির্বাণ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সর্বত্যাগী স্বরাজ-সন্ন্যাসী বিপ্লব কুলতিলকগণ ধরায় এসেছিলেন। কবির কথায় এরাই সাধক-প্রেমিক-পাগল। অভীষ্টের জন্য সকল ভোগ সুখে আগুন জ্বেলে বেড়িয়ে পড়লেন। এঁদের দেশভক্তি—ভগবৎ ভক্তিতে বিলীন **বন্দেমাতরম্**-সিদ্ধ মন্ত্রে এঁদের দীক্ষা।

এই তিনটি তরুণ, কিশোরই বলা চলে, দীক্ষা পেয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী সংস্থার (বি-ভি) পথিকৃৎদের কাছে। বীজমন্ত্র গ্রহণের শুদ্ধ আধার চাই। সন্দেহ নেই—উপযুক্ত আধার পেয়েছিলেন তাঁরা এই তিনটি রত্নের মধ্যে। বীজমন্ত্র ফলপ্রসূ হতে তাই বিলম্ব হয়নি।

দীক্ষান্তে শিক্ষা। চরিত্রগঠন, সদাচরণ, ভগবৎ বিশ্বাস, ত্যাগ, সংযম—এই মহৎ আদর্শই ছিল বিপ্লবী জীবনের বনিয়াদ।

পিতামাতা-গুরুজন-শিক্ষক-প্রতিবেশী-সহপাঠী-সমবয়সী সকলের সংগে আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো একই নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে। এই ভাবে চলতে গিয়েই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে জীবন গঠন সহজ হয়ে আসতো—জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হতো। তারই ফলে দেশের জন্য জীবন দান করে জীবনের সার্থকতা তারা খুঁজে পেতো।

জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ করে দেবার জন্য ১৯৩০ সনে পূর্ববঙ্গে—বিশেষ করে ঢাকায় বিদেশী শাসন-শক্তির দমন নীতি যখন ভয়াবহ, নির্মম, হিংস্র অত্যাচার চালাচ্ছে (জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা উস্কিয়ে দিয়েছে) তখন বিপ্লবী নায়কগণ এই শাসন-শক্তির স্তম্ভগুলির উপর পাল্টা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন।

"তোমরা অত্যাচার চালাও—আমরা জবাব দেবো। কোন ভয়ে ভীত হব না। অত্যাচারের জবাব দেবার মানুষ দেশে আছে—দেশবাসী তা দেখে ভরসা পাবে, আর শাসকগোষ্ঠী তা দেখে ভীত হবে।"—সংক্ষেপে এ হল সে সময়কার কর্মনীতি।

ডাক এলো—'খণ্ড খণ্ড হয়ে মা'র মুখ চেয়ে এসো কে মরতে পারবে।' অভী: মন্ত্রের সাধক **বিনয়-বাদল-দীনেশ**—তাঁরা প্রস্তুত। নির্দিষ্ট কর্মনীতি সফল করার দায়িত্ব নিলেন এই তিন সমর্পিত প্রাণ তরুণ। এই গ্রন্থে **বিনয়-বাদল-দীনেশের** কর্মনীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ।

প্রসঙ্গত বলি,—বিনয় আমার খুড়তোত বোন ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র। বিনয়ের মহা-মৃত্যুর পর ওঁর মা-বাবা আমাকে বিনয় প্রসঙ্গে বলেন—'আমাদের সন্তানের মধ্যে বিনয় ছিল সর্বাধিক বিনম্র। মিষ্টি ছিল স্বভাব, সকলের প্রিয়। বিনয় নাম সার্থক মনে হয়েছে।

এমন শ্রদ্ধাবান বিনম্র চরিত্রের বিনয়ই হতে পারেন ভাবী শহীদ বিনয় বসু।

বুঝি দৈব বশেই সময় পেয়েছিলেন দীনেশ। মা-বৌদি-বোন-ভাইকে খান কয়েক পত্র লিখেছিলেন জেল থেকে। এই পুস্তকে তা উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে বুঝা যায় কোন উর্ধস্তরে এঁরা উঠে গিয়েছিলেন।

আমরা গীতা পড়ি—মর্ম বুঝি না ; আর বুঝলেও আচরণ করি বিপরীত। মৃত্যু মিথ্যা বলেও মৃত্যুকে ভয় করি। দীনেশ বলেন—মৃত্যু আমার মিত্র। 'তুঁহ মোর শ্যাম সমান'। 'মৃত্যুর গর্জন শোনে সঙ্গীতের মতো'।

যেন গীতোক্ত জীবনদর্শন, গীতা ধর্ম-সাধনার সিদ্ধি। গীতা বলেছেন—নিমিত্ত মাত্র ভব—যুদ্ধ কর, আবার গীতাই বলেছেন—নির্বৈর ভব! শ্রীভগবানের আদিষ্ট কর্ম,—তিনি যন্ত্রী-আমি যন্ত্র, এইতো মামেকং শরণং ব্রজ—দ্বেষ হিংসার বহু ঊর্ধে জীবনদানে নবজীবন লাভের তপস্যা।

প্রায় অর্ধ শত বর্ষ পূর্বে বিপ্লববাদ গ্রন্থে লিখেছিলাম—'মৃত্যুবরণ করে একটা জাতি বাঁচে, আবার বাঁচাকে আকড়িয়ে থেকে একটা জাতি মরে।'

সে ছিল একটা ভাবগত উক্তিমাত্র—কিন্তু তা যে এমন বস্তুগত হতে পারে তাও দেখলাম **বিনয়-বাদল-দীনেশ** এবং বিপ্লবীগণের জীবন-দিয়ে জীবন লাভের তপস্যায়। আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।

সত্য কালজয়ী। শুনেছি পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রগণ **বিনয়-বাদল-দীনেশের** স্মৃতি-দিবস পালন করছেন। বিস্মিত হইনি। এই মহামরণের সত্য যে কালজয়ী।

ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধের নেপথ্য নায়কদের মধ্যে কয়েকজনের অভিমত

বিনয়কে দেখেছি একান্ত কাছে থেকে। শান্ত, সমাহিত, সৌম্য। কিশোর বয়স থেকে বিনয় ধীর, স্থির—চেহারার মধ্যে ছিল তেমনি কমনীয়তা, যা সকলকে মুগ্ধ করত।···পরিচিত কেউ ভাবতে পারেনি, অতবড় দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক কাজ এই তরুণ একা সম্পূর্ণ করবার শক্তি রাখে। ঢাকায় লোম্যান-হডশন আক্রমণে বিনয় বসুর সত্যিকারের পরিচয় উদ্ঘাটিত হল। সে কাহিনী যে কোন গোয়েন্দা কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর।

বাদল সেই জাতের বীর, যে এল, জয় করল, কিছুমাত্র কামনা না রেখে নিঃশেষে চলে গেল। 'বালক বীরের' বেশে এই বীর 'ভারত জয়' করেছিল সেদিন।

দীনেশ তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি তার গভীর উপলব্ধি। জন্ম জন্ম সাধনা করে মহাসাধক যা পান না, দীনেশ সেই মহামূল্য অমৃতের অধিকারী।

রসময় শূর

…বিনয় বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। অসম্ভবের নায়ক। যৌবনের অগ্রদূত।

বাদলকে সেই যে একটিবার মাত্র সকলে দেখল, আর তার সাক্ষাৎ মিলল না। নীরব, নিঃশঙ্ক চিত্তে রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে অধিনায়ক বিনয় বসুর নির্দেশে সব কর্তব্য একের পর এক সম্পন্ন করে যেমন নীরবে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, ঠিক তেমনি নীরবে বিজয়ীর বেশেই রণক্ষেত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। পৃথিবীর কোন রঙ্গমঞ্চে বোধ হয় এতবড় বীরত্বের কাহিনী আজও অভিনীত হয়নি।

সাতমাস দীনেশ বেঁচে ছিল আলিপুর জেলের কনডেম্‌ড সেলে। সে সেল আজ ভারতবর্ষের প্রাণতীর্থ। এই পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে দীনেশের যে গভীর উপলব্ধি, তা আজ সমগ্র জাতির বিপ্লবী দর্শন।

নিকুঞ্জ সেন

'বিনয়-বাদল-দীনেশ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া কি যে খুশি হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। সম্ভব হইলে সময় করিয়া একবার আসিবেন। অমি এ সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য দিতে পারিব।

বিশেষ কি! আপনার বৌদি ভালই আছেন। আমাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ রহিল।

১৫ই আগষ্ট। ১৯৬৬ সন।

সবার মত আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলাম রাইটার্স বিল্ডিং-এ। ঠিক হয়েছিল ঐ দিনেই বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেই ঐতিহাসিক অলিন্দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। বিভিন্ন খবরের কাগজেও সেকথা প্রকাশ করা হয়েছিল বেশ ফলাও করে।

কিন্তু একথা কোন কাগজেই প্রকাশিত হয়নি যে, শাসক সম্প্রদায়ের কারো কারো অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে সে অনুষ্ঠান সেদিন আদৌ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

অমি রাজনীতির ছাত্র নই। রাজনীতির সংগে কোনদিনই সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। আজো তাই রয়েছি। তবু পূণ্যাত্মা শহীদদের মর্য্যাদাকে এভাবে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে মনে মনে সেদিন আহত না হয়ে পারিনি। মনে জেগে উঠেছিল অসংখ্য প্রশ্ন। কেন পূর্ব-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হল এভাবে! কার ইঙ্গিতে!

এ জিজ্ঞাসা শুধু আমার নয়, শত শত মানুষের। আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতি বা দলবাজী কোনটার সংগেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই। আমাদের কাছে সব শহীদই এক ও অভিন্ন। সবাইকেই আমরা শ্রদ্ধা করি সমানভাবে। সেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা বা মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের মধ্যে—কে বড়, কার আবেদন বেশি, সে কথা আমরা চিন্তাও করিনি কোনদিন। করতে অভ্যস্থও নই।

তাহলে কেন এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব? কেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শহীদদের নিয়ে এই অশোভন চালবাজী?

পরের বছরই সেই প্রতিকৃতি স্থাপিত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর উদ্যোগে এবং মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর সভাপতিত্বে গত ১৯৬৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর। সবার আগে রাজ্যপাল ধরমবীর সেদিন মাল্যদান করেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশের সেই প্রতিকৃতিতে।

কই, প্রশাসন যন্ত্রতো অচল হয়ে গেল না! যেমন ছিল, তেমনিই তো রয়ে গেল সব। তাহলে এক বছর আগে হতে বাধা ছিল কোথায়?

সেদিনই পুণ্যাত্মা শহীদ **বিনয়-বাদল-দীনেশ** সম্বন্ধে কিছু লিখতে প্রেরণা পেয়েছিলাম মনে মনে। বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছিলামও কিছু কিছু। **'বিনয়-বাদল-দীনেশ'** গ্রন্থ তারই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

লেখার ব্যাপারে সবচাইতে বেশী সহযোগিতা পেয়েছি **'বি-ভি'**র অন্যতম নায়ক, প্রবীণ-বিপ্লবী, শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কাছ থেকে। তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে এ বই লেখা হয়তো কোনদিনই সম্ভব হতোনা।

এ প্রসঙ্গে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের উৎসাহী তরুণদের সহযোগিতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনের মুহূর্তে ওরাই আমাকে সব কটি বই এগিয়ে দিয়েছেন হাতের কাছে।

অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় অসুস্থতা সত্বেও বইটির জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সবাইকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২১ বি, ফার্ন রোড
কলিকাতা—১৯

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। কিছু কিছু নতুন তথ্যও দেয়া হল নতুন মুদ্রণে।

দীনেশ গুপ্ত পরিচালিত শোভাযাত্রার তথ্যটি পরিবেশন করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ (মুকুল)। তিনি নিজে সেদিন সেই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন দলের একজন সদস্যরূপে। তারিখটা ছিল ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সন।

ফাঁসির পূর্বে মাংস খাবার ঘটনাটি জানিয়েছেন অন্যতম সহবন্দী শ্রীযুক্ত সুনীল সেনগুপ্ত। দাদা-বৌদি প্রতিষ্ঠিত কভারের ছবিটি পরিবেশন করেছেন বাগু-পল্লীনিকেতনের···শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দত্ত।

এদের সবার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

২১ বি, ফার্ন রোড
কলিকাতা—১৯
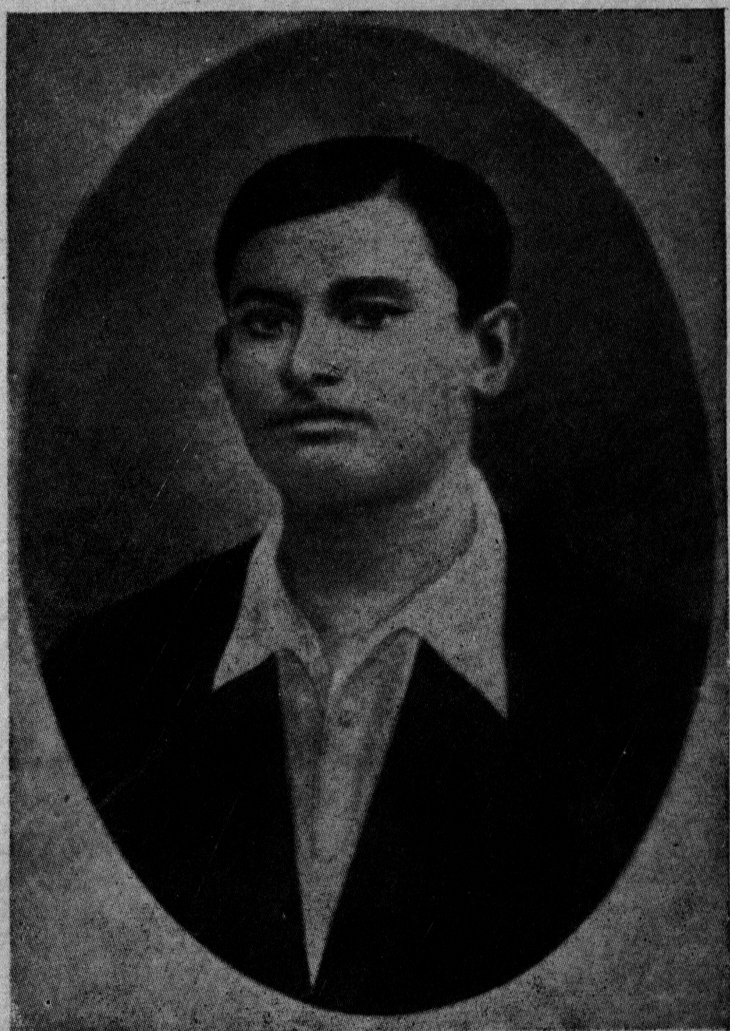
বিনয়

বাদল

দীনেশ (ফাঁসির পূর্বদিনে গৃহীত ছবি)
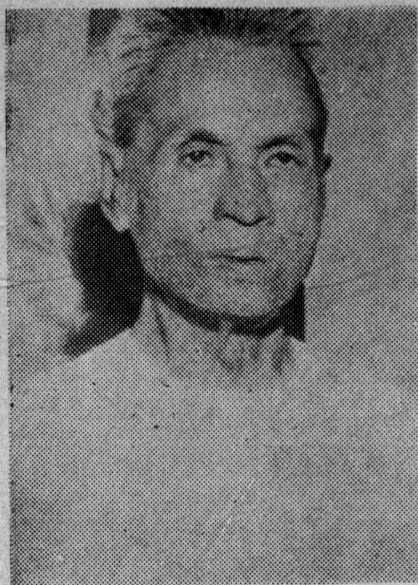
হেমচন্দ্র ঘোষ
(সর্বাধিনায়ক বি. ভি.)
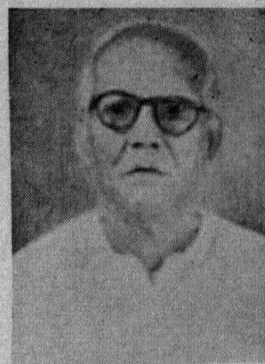
হরিদাস দত্ত
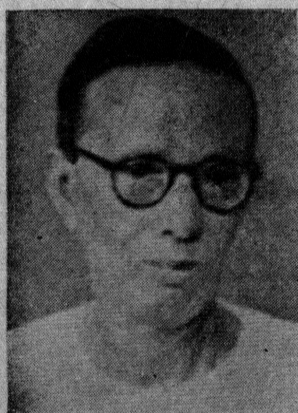
রাজেন্দ্র কুমার গুহ

সরযূ দেবী
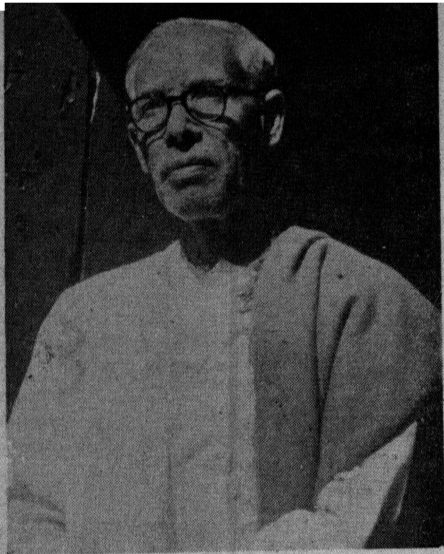
রসময় শূর
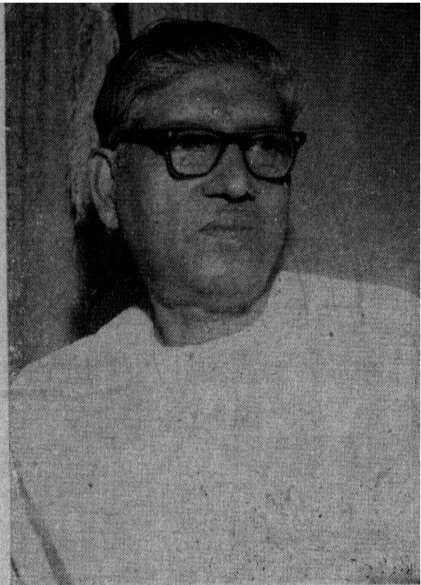
প্রফুল্ল দত্ত
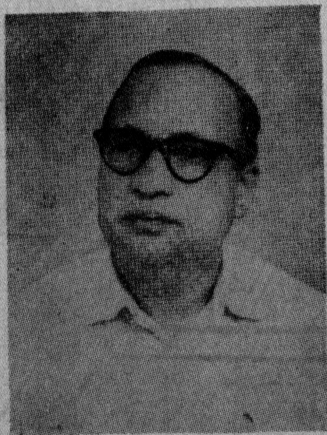
জ্যোতিষ জোয়ারদার
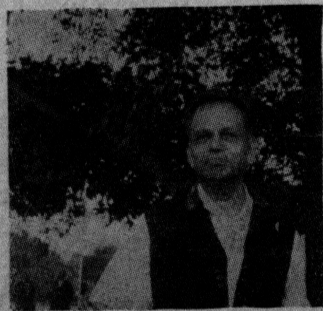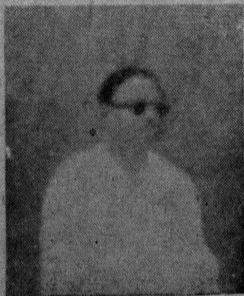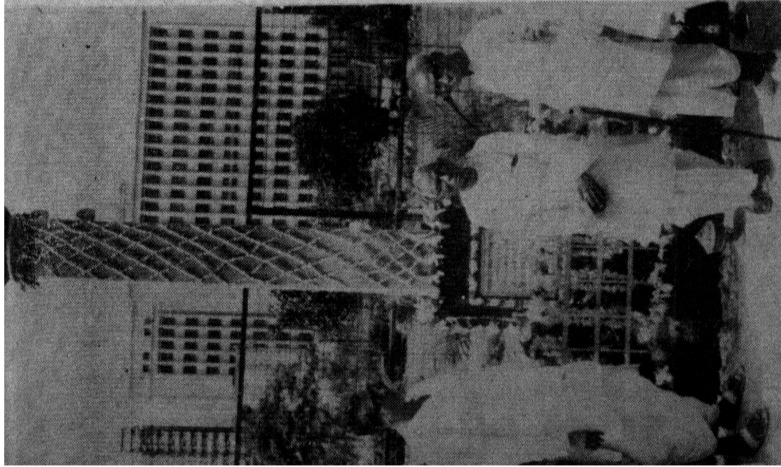
নয়-বাদল-দীনেশের শহীদস্তম্ভ (ডালহৌসী স্কোয়ার)
সামনে দাঁড়িয়ে (ডানদিক থেকে)
সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী ও
মেয়র গোবিন্দ চন্দ্র দে

শহীদ দিবসে পুষ্পপত্র সজ্জিত ফাঁসিমঞ্চ

মেটিয়াবুরুজের দাদা বৌদি প্রতিষ্ঠিত শহীদস্তম্ভ

৯ই আগষ্ট রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয়-বাদল-দীনেশের ছবিতে
মালা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

এই সেই শহীদ তীর্থ।

আজ ৮ই ডিসেম্বর। ওদের প্রতি আজ আমাদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন।

কথা বলো না। আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যাও। দেখো, ওদের ঘুম ভেঙে যায়না যেন।

এবার এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাও। একেবারে সোজা দোতলায়।

ওরাও সেদিন এমনি করেই দোতলায় উঠে গিয়েছিল মল্লিকা। এই সিঁড়ি বেয়েই।

এই সেই ঐতিহাসিক অলিন্দ. যেখানে সেদিন 'বারান্দা ব্যাটল্' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক দুঃসাহসিক, চমকপ্রদ অধ্যায়, যা আজো অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায়।

এই দেখো ওদের ছবি।

ওরা তিনজন। বিনয়-বাদল-আর দীনেশ।

এখানে মাথা নোয়াও মল্লিকা। প্রণাম করো।

মৌন অতীত আজ মুখর হয়ে উঠেছে। কান পেতে শোন। তাকিয়ে দেখো, অদৃশ্য কালির অক্ষরে কি লেখা রয়েছে এখানকার প্রতিটি ইট-পাথরে! লেখা রয়েছে ঃ

'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

কথার কথা নয়। ফাঁকা আওয়াজ নয়। সত্যই সেদিন বাংলা দেশের তরুণ রক্ত সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠেছিল মল্লিকা।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সন।

হাসিমুখে মৃত্যুবন্দনা করার যে গৌরবোজ্জল ইতিহাস এই ক'বছরে বাংলাদেশে রচিত হয়েছিল, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

কিন্তু কেন?

অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক কর্মধারা ভারতবর্ষে প্রথম শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল যথারীতি। তারপরই একেবারে চুপ।

কেন তাদের এই বেমানান নিঃশব্দতা? কি এর কারণ?

কারণ গান্ধীজী।

গান্ধীজীর তখন একমাত্র লক্ষ্য,—বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি। ওদের চাই-ই। ওদের দূরে থাকার অর্থই হল দেশের শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে বঞ্চিত থাকা। তা হয় না। যে করে হোক, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে টেনে আনতে হবে।

কিন্তু ওরা সে কথা শুনবে কেন?

অহিংস নীতিতে ওরা আস্থাবান নয়। আবেদন নিবেদন বা দর কসাকসিতেও অভ্যস্থ নয়।. সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কে পারে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাছে টেনে আনতে?

দেশবন্ধু। তিনিই একমাত্র লোক, যার কথার উপর ওদের কিছুটা আস্থা আছে।

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা। সত্যিই সেদিন বিপ্লবীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন দেশবন্ধু সম্বন্ধে।

অপরপক্ষে দেশবন্ধু সম্বন্ধেও কথাটা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

বিপ্লবীদের প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই তিনি বলতেন—'ওদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কথা ভাবলে আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।'

ডাক শুনে সবাই সেদিন জড় হলেন দেশবন্ধুর গৃহে। গান্ধীজীও সেখানে উপস্থিত। তারপরই তিনি তাঁর দাবী রাখলেন বিভিন্ন বিপ্লবী-নায়কদের কাছে। 'তোমরাও কংগ্রেসে এসো ভাই। কেউ দূরে থেকোনা।'

'Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt Non Violent Non Co-operation.'

[ভারতবর্ষের তরবারী থাকলে আমি তাদের তা ব্যবহার করতে বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই বলছি যে, তোমরা অহিংস-অসহযোগের পথ গ্রহণ কর।]

আরো স্পষ্ট করে বললেন গান্ধীজী :

'Non-Violence may be accepted as creed or policy. I am out to destroy this Satanic Government.'

[অহিংসাকে বিশ্বাস এবং কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর]

রাজী হলেন বাংলার বিপ্লবী নায়কগণ।

তবে একটি সর্তে। পরীক্ষামূলক ভাবে কিছুদিন আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখবো, কিন্তু যদি দেখতে পাই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনি আপনার দাবী আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেদিন কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে আমাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

দেখতে দেখতেই কেটে গেল ১৯২৯ সন।

আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিপ্লবীনায়ক বৃন্দ। গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীনতা এনে দেবেন।

কোথায় স্বাধীনতা ! কোথায় তার সেই প্রতিশ্রুতি !

না, আর দেরী নয় ! কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে ! এবার আমরা আমাদের নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে চলবো। সবাই প্রস্তুত হও তার জন্য।

আবেদন নিবেদন নয় ! দর কসাকসিও নয়। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। নিজের শক্তি দিয়েই আমরা তা অর্জন করবো।

এল ১৯৩০ সন ! শুরু হল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

এই হল সেদিনের সেই সংগ্রামের পটভূমিকা। বিনয়-বাদল-দীনেশের কাহিনী সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরই একটা অংশ মাত্র।

প্রশ্ন হতে পারে যে,—কেন বিপ্লবীদের এই প্রচণ্ড প্রয়াস ? সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়। অস্ত্রশস্ত্রও খুবই সামান্য। এই সামান্য মূলধন দিয়ে দু'চারটে সাহেব মারলেই কি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ?

বিপ্লবীরা নির্বোধ বা ভাবপ্রবন নয় মল্লিকা। দুচারটে সাহেব মারলেই যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে না, সেকথা তাঁরাও কারো চাইতে কম জানতেন না।

তা হলে জেনে শুনেও কেন এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা ? কেন একের পর এক এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন ?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বিপ্লবীনায়ক বারীন ঘোষের বহুদিন আগেকার একটা বিবৃতির মধ্যে।

'We did not mean or expect to liberate our Country by killing a few Englishmen. We wanted to show people how to dare and die.'

ক্রমাগতঃ ঘা খেয়ে খেয়ে জাতির মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়েছে। নিজেদের নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই সেই সব আধমরাদের আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মৃত্যু মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। সুতরাং নির্ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন বিদেশের কারাগারে প্রথম প্রাণদানকারী শহীদ মদনলাল ধিংড়া। বিচার কালে ইংল্যাণ্ডের আদালতে দাড়িয়ে তিনি বলেছিলেন :

'The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves.'

[ভারতবর্ষকে এখন কেবলমাত্র একটি শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে, সে হল মৃত্যুবরণের শিক্ষা। তার পদ্ধতিও মাত্র একটি ; নিজে মৃত্যু-বরণ করে মৃত্যু ভয়হীন হবার শিক্ষাদান]

সেই একই কথা। একই বক্তব্য। স্বাধীনতা পেতে হলে সর্বাগ্রে মৃত্যুকে জয় করতে হবে। ভীরু বা কাপুরুষদের জন্য স্বাধীনতা নয়।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য মল্লিকা। প্রমাণ পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'ভারতছাড়' আন্দোলন।

কেউ সেদিন মৃত্যুকে ভয় পায়নি। কেউ পিছিয়ে যায়নি। বরং দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী সেদিন নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বেয়নেটের কাছে।

হাজার হাজার নরনারী মৃত্যুবরণ করেছিল পুলিশ ও মিলিটারীর বেপরোয়া গুলীবর্ষণের ফলে, তবু দুর্জয় সঙ্কল্পে ভরপুর হয়ে একটি কথাই তারা উচ্চারণ করেছিল শেষ পর্যন্ত—'ইংরেজ ভারত ছাড়। কুইট্ ইণ্ডিয়া।'

বিপ্লবীরাই কি তার পথ প্রদর্শক নয় ? কি করে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তারাই কি তা সবাইকে দেখাননি নিজেদের নিঃশেষ আত্মবির্জনের মধ্যে দিয়ে ?

যাক, এবার আমাদের আসল কাহিনীতে আমরা ফিরে যাই।

'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

মহানগরীর বুকে পোস্টার পড়েছে। লালে লাল হয়ে গেছে পথ-ঘাট, অলিগলি, সবকিছু। রক্তের মত লাল।

ধুক ধুক করে কাঁপছে মহানগরীর বুক।

সবার মুখে একই প্রশ্ন। সবার মনে একই গুঞ্জন। কি ব্যাপার! কিসের পোস্টার এগুলো!

কথাগুলোর মধ্যে কিসের যেন একটা ভয়ঙ্করতার আভাস রয়ে গেছে। মনে হয় কিছু যেন একটা ঘটবে।

সত্যিই ঘটেছিল। শুধু মহানগরী নয়, রক্তে রক্তে সেদিন গোটা বাংলাদেশটাই বুঝি লালে লাল হয়ে গিয়েছিল।

আজ সেই ইতিহাসের একটি ছেঁড়াপাতা তোমার কাছে তুলে ধরব মল্লিকা।

এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানানোর সাধ্য আমার নেই।

আমার কেন, কারোরই নেই। কারণ এই ইতিহাস নায়কদের সেদিন সবচাইতে বড় কথাই ছিল 'মন্ত্রগুপ্তি'। অর্থাৎ কোন কথা নয়। কোন প্রশ্ন নয়। শুধু নিঃশব্দে সৈনিকের মত এগিয়ে যাও।

সাবধান! মানুষ তো দূরের কথা, কাক-পক্ষীও যেন কোন কিছু টের না পায়। সুতরাং লোকচক্ষুর আড়ালে কোথায় যে কার কতখানি রক্ত ঝরেছিল, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়!

জানাতে গেলেও সে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আর কিছুটা অনুমানের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

তাই সেই অসম্ভবের পেছনে না ছুটে আমি শুধু কিশোর মনের ঘুম-ঘুম চোখে সেদিন যাকে দেখেছিলাম, একান্ত ভাবে ভালবেসে-ছিলাম, আমার সেই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের কথাই তোমাকে শোনাবো মল্লিকা। সে হিসেবে এ কাহিনীকে ইতিহাস না বলে বরং ইতিহাসের ভগ্নাংশ বলে ধরে নিতে পার।

১৯৩০ সন।

তখন আমি ঢাকার নবকুমার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি।

এপ্রিল মাস। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। শহরের দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়েছে যথারীতি।

হঠাৎ কি একটা খবর শুনে গোটা শহরে সাড়া পড়ে গেল।

গতরাত্রে, অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা এক অভাবনীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে।

চট্টগ্রাম স্বাধীন। মুক্ত।

ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে এখন ভারতের জাতীয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

মল্লিকা, সারা সহর জুড়ে সে কি উত্তেজনা! সে কি উন্মাদনা!

সবার মুখে এক কথা। শাবাশ চট্টগ্রাম! শাবাশ মাস্টারদা! শাবাশ চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীবৃন্দ! তোমরা দেখিয়েছ বটে।

এ উচ্ছ্বাস বেশীক্ষণ রইল না মল্লিকা। শুরু হল আহত ব্রিটিশ-সিংহের প্রচণ্ড আক্রমণ ও নির্মম নির্যাতন। তাদের ধারণা, পলাতক বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি তখন ঢাকাতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। যে করে হোক, তাঁদের শির চাই।

সে কি পাশবিক অত্যাচার! বল কোথায় রেখেছ তাদের? বলতেই হবে। নইলে তোমাদেরও রেহাই নেই।

পরের ইতিহাস তুমি সবই জানো মল্লিকা। বিপ্লবের ইতিহাস এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে অবশেষে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

তা বলে বীরত্ব, দেশপ্রেম ও সাংগঠনিক ব্যাপারে সেদিন পরাধীন-

জাতির কাছে চট্টগ্রাম যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল, তা কিন্তু ব্যর্থ হল না মল্লিকা। বরং ঠিক তার উল্টো।

যে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ এতদিন এখানে ওখানে টিপ্‌টিপ্‌ করে জ্বলছিল, এবার তা একসঙ্গে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। সে-কথাই এখন তোমাকে বলব।

আমরা তিন বন্ধু। গণেশ মিত্র, আমি ও রঞ্জিত বোস এক ক্লাসে পড়ি। থাকিও একই পাড়াতে। প্রাত্যহিক দেখাশোনার ফলে স্বভাবতঃই আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সবাই ঠাট্টা করে বলত—'ত্রি-মূর্তি'।

সেদিন ছিল শনিবার। কিছুক্ষণ আগে স্কুল থেকে বাসায় ফিরে এসেছি। হঠাৎ গণেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—চল, ম্যাচ খেলা দেখে আসি।

—কোথায়?

—মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে। দারুন টেনিস খেলা হবে আজ।

রাজী হয়ে গেলাম। না হয়ে উপায়ও ছিল না।

গণেশ চিরদিনই বন্ধুবৎসল। পকেট উজাড় করে সবাইকে খাওয়াতে ওর জুড়ি নেই। শুধু সেদিন নয়, আজও ওর সেই অভ্যাসটি তেমনিই রয়ে গেছে। এ-হেন বন্ধুর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে উপায় কি!

শেষ পর্যন্ত আমরা তিন বন্ধুই গেলাম। ছেলেমানুষ বলে জায়গাও পেয়ে গেলাম বেশ সামনের দিকেই।

মিনিট কয়েক বাদেই খেলা শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কখন তন্ময় হয়ে ডুবে গেলাম। খেলা দেখে নয়, আমাদের দিকের খেলোয়াড়টিকে দেখে।

কি উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত এই খেলোয়াড়টি। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। পাতলা অধরোষ্ঠ। সুগঠিত দেহ ঘিরে একটা আভিজাত্যের ছাপ। সব মিলিয়ে এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ যেন। খুব সম্ভব

কোন রাজপুত্তুর। রাজপুত্তুর ছাড়া এত সুন্দর চেহারা কারো হতে পারে না।

মল্লিকা, কেন জানি সেই খেলোয়াড়টিকে দেখে সেদিন আমার রাজপুত্তুরের উপমাটাই সর্বাগ্রে মনে এসেছিল। আজকের এই কাহিনীতেও আমি তাকে ঐ নামেই উল্লেখ করব।

—হাইক্লাস খেলে, না রে! ফিসফিস্ করে এক সময়ে বলল গণেশ। জানিস, ওর নাম বিনয় বোস। মেডিক্যাল স্কুলের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, মস্ত বড়লোকের ছেলে। লেখা-পড়াতেও খুব ভাল।

—তুই জানলি কি করে? প্রশ্ন করলাম।

—মেজদা বলেছে। বিক্রমপুরের রাউথভোগে ওদের বাড়ি। ওর বাবার নাম রেবতীমোহন বোস। থাকেন জামসেদপুরে। মস্তবড় শিকারী।

খেলা বেশ জমে উঠেছে। ঠিকই বলেছে গণেশ। সত্যিই ওর খেলার তুলনা হয় না। মারের কি বাহার। বলিষ্ঠ হাতের মারে এরি মধ্যেই যেন বিপক্ষ দল একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা গণেশের স্বভাব নয়। একটু বাদেই আবার সে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল,—জানিস, ওর বাবার বন্দুকের গুলি কোনদিনও মিস্ হয় না।

—তোর মেজদা বলেছে বুঝি? ফুট কাটল রঞ্জিত।

—হ্যাঁ, বলেছেই তো। একশোবার বলেছে। তাতে তোর কি?

মেজদাকে নিয়ে গণেশ ও রঞ্জিতের এই খিটিমিটি বলতে গেলে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেদিনও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আজও যায় নি।

খেলা শেষ। খেলোয়াড়রা বেরিয়ে আসছেন একে একে। হঠাৎ কি হল কে জানে, রাজপুত্তুরকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেই ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—আপনি খুব ভাল খেলেন।

—তাই বুঝি? সলজ্জ হাসির সঙ্গে মুখের রক্তাভা মিশে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য রেখায়িত হয়ে উঠল রাজপুত্তুরের সারা মুখে।

—হ্যাঁ, তাইতো। আমার ভীষণ ভাল লেগেছে আপনার খেলা!

—তাই নাকি! চোখে-মুখে কৌতুক ঝলসে উঠল রাজপুত্তুরের —তা, টেনিস খেলা এমন কিছু শক্ত নয়। চেষ্টা কর, তুমিও পারবে।

—আমি শিখব। আগ্রহ ভরে বললাম, একটু দেখিয়ে দেবেন আমাকে।

—কেন দেব না! রাজপুত্তুরের সারা মুখে শিশুর সারল্য। তুমি আমার কাছে মাঝে মাঝে এস, নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেব। আরমানি-টোলার পিকচার হাউস চেন তো? আমি ওর সামনেই মেডিক্যাল মেসে থাকি। ওখানেই এস, বুঝলে!

প্রায় নাচতে নাচতে ফিরে এলাম। কল্পনায় ভাবতে লাগলাম, ঐ রাজপুত্তুরের মতই আমি যেন মস্ত বড় একজন টেনিস খেলোয়াড় হয়ে গেছি।

সবার মুখে মুখে আমার নাম। সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যেমন পঞ্চমুখ রাজপুত্তুরের বেলায়।

রবিবার ছাড়া ছুটি ছিল না, তাই ঐদিনই আমি যথাস্থানে চলে গেলাম, কিন্তু কোথায় রাজপুত্তুর!

মেসের সবাই বললে,—কাকে চাইছ! বিনয়কে! তবেই হয়েছে! ও যে কখন থাকে আর কখন যায়, সে-কথা অন্যে তো দূরের কথা, ও নিজেও বোধহয় বলতে পারবে না।

পরের রবিবার গিয়েও রাজপুত্তুরের দেখা পেলাম না। তার পরের রবিবারও না।

দেখা পেলাম বেশ কিছুদিন বাদে।

দেখেই রাজপুত্তুর সহাস্যে আহ্বান জানালেন—আরে এস, এস। শুনলাম ক'দিন এসে ঘুরে গেছ। সরি, ছিলামনা এখানে। বিক্রমপুর থেকে ঘুরে এলাম। দেখ না, পায়ে কেমন ফোস্কা পড়েছে। অনেক হাঁটতে হয়েছে কিনা!

—বেড়াতে গিয়েছিলেন বুঝি? প্রশ্ন করলাম আমি।

—উহুঁ, রোগী দেখতে। হা-হা করে হেসে উঠলেন রাজপুত্তুর, হাত পাকাতে হবে তো।

শুরু হল নানারকম গল্পগুজব। কত কথা। জানা-অজানা কত কাহিনী। দেশ-বিদেশের কত কথা। কথার যেন আর শেষ নেই।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম রাজপুত্তুর মুখের দিকে।

আশ্চর্য! কোথায় কি হচ্ছে, তার কত খবরই না রাখেন উনি!

ওঁর সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের সত্যিই নাগাল পাওয়া দায়।

হঠাৎ এক সময় রাজপুত্তুর বললেন, তারপর তোমার টেনিস খেলার কি হল বল? দেখি হাতটা।

নিমেষে আমার হাতটা নিজের মুঠিতে টেনে নিয়ে সজোরে চাপ দিতে দিতে আবার বললেন রাজপুত্তুর, এ যে বড্ড নরম হাত দেখছি। হাতের কব্জি আরো মজবুদ হওয়া দরকার। কব্জিতে জোর না থাকলে লড়াই করবে কি করে? এখন থেকে রেগুলার ব্যায়াম করবে, বুঝলে? জোর চাই। হাতে জোর চাই। বুকে সাহস চাই! তবেই না।

—আপনার গায়ে তো ভীষণ জোর। সাহস করে বললাম, শুনেছি আপনার বাবা নাকি খুব ভাল বন্দুক চালাতে জানেন। আপনিও জানেন নিশ্চয়ই?

—আমি! নিমেষে দুচোখ কপালে উঠে গেল রাজপুত্তুরের, আমি চালাব বন্দুক! তবেই হয়েছে। বন্দুক চালানো তো দূরের কথা, ওর নাম শুনলেও আমার গায়ে জ্বর আসে।

বিশ্বাস হল না মল্লিকা! অমন যাঁর স্বাস্থ্য, তিনি বন্দুকের নাম শুনে ভয়ে মূর্ছা যাবেন, এটা কোন কাজের কথা নয়? নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে।

সেদিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। বিদায় নেবার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ কি ভেবে তিনি প্রশ্ন করলেন,—ভারতের ইতিহাস পড়েছ নিশ্চয়ই? বল তো জালিয়ানওয়ালাবাগ কি জন্য বিখ্যাত?

ইতিহাস পড়া ছিল, তাই বইয়ের ভাষাতেই গড় গড় করে বলে ফেললাম,—এখানে জেনারেল ও'ডায়ার নিরস্ত্র ভারতবাসীদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া প্রায় সহস্রাধিক লোককে হত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদে তাঁহার 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

—থামলে কেন? তারপর? তারপর কি হল বলে যাও।

সেরেছে। দর দর করে ঘামতে লাগলাম। তারপর আবার কি! এ ছাড়া আর কিছু তো আমার জানা নেই।

জানা নেই! বল কি? কেমন যেন অপরিচিত শোনাল রাজপুত্তুরের গলাটা. তার পরেরটুকুই তো আসল। বেশ, আমিই বলছি, তুমি শুনে যাও।

মল্লিকা, কৈশোরের সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলোকে পেছনে ফেলে আজ অনেক আয়ুর পথ পেরিয়ে এসেছি, তবু চোখ বুজলে এখনো যেন আমি রাজপুত্তুরের সেদিনের সেই উদাত্ত কণ্ঠের ধারালো কথাগুলোকে শুনতে পাই। তিনি বলেছিলেন—

—ও'ডায়ারের সেই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ফলে অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং উল্টো আরো তিনি এই বলে দম্ভ প্রকাশ করলেন, 'দুঃখিত,

সেদিন আমার সমস্ত গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, নইলে ওগুলোরও ব্যবহার করতাম। ভুল করেছি মেশিনগান সঙ্গে না নিয়ে।'

শিউরে উঠলাম রাজপুত্তুরের কথা শুনে। কি ভয়ঙ্কর কথা! ও'ডায়ার কি মানুষ, না পিশাচ!

—শুধু ও'ডায়ার নয়। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পাঞ্জাবের ইংরেজ গভর্ণরের মুখ থেকে। তিনি বললেন, 'না, কোন অন্যায় হয়নি। ও'ডায়ার যা করেছ, ঠিকই করেছে।'

এমন কি বিলেতের হাউস অফ লর্ডস-এর মতও তাই। তারা আরো উল্টে ও'ডায়ারকে ধন্যবাদ জানাল।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন বিলেতের অভিজাত-শ্রেণীর মহিলারা। তাঁরা শুধু ধন্যবাদই নয়, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে ও'ডায়ারকে উপহার দিলেন তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের জন্য।

বীরত্ব। হঠাৎ যেন চোখ দুটো জ্বলে উঠল রাজপুত্তুরের, হাজার লোককে একটা বন্ধ জায়গায় আটকে রেখে নির্বিচারে হত্যা করাটা হল ওদের কাছে বীরত্ব! বীরত্বই বটে!

—তবে ও'ডায়ারকে আমি এজন্য দোষ দেব না। ঠিকই করেছেন তিনি। পৃথিবীতে পরাধীন-জাতির বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। তাদের মরাই উচিত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রাজপুত্তুরের মুখের দিকে।

আশ্চর্য, কিসের যেন একটা অবরুদ্ধ আক্রোশে রাজপুত্তুরের চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। দেখলেই ভয় করে।

পরীক্ষার চাপ ছিল বলে এর পরে আর কিছুদিন রাজপুত্তুরের ওখানে যেতে পারিনি।

গিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পরে। দেখাও পেয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় সেই সদাহাস্যময় রাজপুত্তুর! কি এক অজ্ঞাত কারণে যেন সেদিন তিনি গম্ভীর, করুণ, স্বল্পবাক।

আমাকে দেখে বেশ একটু অপ্রসন্ন ভাবেই যেন বললেন, 'কি চাই? আমি খুব ব্যস্ত।'

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই কি আমার এতদিনকার সেই রূপকথার রাজপুত্তুর। এ যে বিশ্বাসই হয় না।

অভিমানে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতেই আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে। আর এখানে থাকার কোন অর্থ হয় না।

—শোন! কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে অসীম মমতাভরে বললেন রাজপুত্তুর,—তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। সত্যি আমি খুব ক্লান্ত। আর তুমি এখানে এসো না যেন। অন্ততঃ মাসখানেক ত' নয়ই। আমাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে।

স্নেহের তরঙ্গায়িত স্পর্শে নিমেষে সমস্ত অভিমান বাষ্প হয়ে উবে গেল। বললাম, সামনে পরীক্ষা বুঝি?

—পরীক্ষা! সহসা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন রাজপুত্তুর। হাঁ, পরীক্ষা। সব চাইতে বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাশ আমাকে করতেই হবে। পাশ আমি করবই।

পায়ে পায়ে ফিরে এলাম। মনে অসংখ্য প্রশ্ন। কি ব্যাপার! কেন আজ রাজপুত্তুরের এই ধোঁয়াটে কথাবার্তা ও রহস্যময় চালচলন!

মনে হয় কিছু একটা হয়েছে। অনেক ভাবলাম, কিন্তু রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

তিন-চারিদিন পরের কথা। বেলা তখন এগারোটা। ক্লাসে রোলকল শুরু হয়েছে যথারীতি।

এমন সময় আমাদের হেড-স্যার অনাথবাবু এসে জানালেন, আজ আর ক্লাস হবে না। একা যেও না, সবাই দল বেঁধে বাসায় চলে যাও। পথে-ঘাটে কিছু হলে আমাকে খবর পাঠিও. আমি চারটে পর্যন্ত স্কুলেই থাকব।

সবাই অবাক। কি ব্যাপার! ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়া তো প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে কি তাই শুরু হল? নইলে এ ধরনের নির্দেশ দেবার কারণ কি?

গণেশ আজ স্কুলে আসেনি। এলে বড় ভাল হত। ও অনেক রকম খবর রাখে। হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত।

—কি ব্যাপার রন্টু? এগিয়ে গিয়ে রঞ্জিতকে প্রশ্ন করলাম।

—কি জানি। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল রঞ্জিত, চল বাসায় যাই, তারপর না হয় গণেশের কাছ থেকেই জানা যাবে। তেমন কিছু হলে কি আর সে কথা পেটে রাখতে পারবে! দেখবি, বলার জন্য ছট্ফট্ করে ছুটে আসবে।

হলও তাই। গেট পেরিয়ে বাইরে পা দিতেই দেখি আমাদের গণেশ বাবাজী ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। উত্তেজনায় সারা মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, এখুনি বুঝি তার চোখ-মুখ ছিটকে রক্ত বেরিয়ে আসবে অজস্র ধারায়।

—কি রে? প্রশ্ন করল রঞ্জিত, স্কুলে এলিনে যে আজ!

—মেজদা মানা করছে। জানিস কি হয়েছে! দারুন ব্যাপার।

সহসা ডান হাতের একটা আঙুলকে পিস্তলের ভঙ্গীতে তুলে ধরে গণেশ বলল, ফটাস্। ফটাস্। ব্যাস, দু-দুটো সাহেব খতম।

চমকে উঠলাম গণেশের কথা শুনে। কি সর্বনাশ। মাত্র চারদিন

আগে কলকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের উপর বোমা পড়েছে। এরই মধ্যে আবার এই কাণ্ড। কে খতম হল? ব্যাপারটা ঘটলই বা কোথায়?

কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। দেখা গেল এ ব্যাপারে গণেশের নিজের ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। ছুটো সাহেব খতম হয়েছে, এইটুকু সে শুধু শুনেছে, কিন্তু কোথায়, কি বৃত্তান্ত কিছুই তার জানা নেই।

—কেন, তোর মেজদার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারলি নে? ফুট কাটল রঞ্জিত।

—সব সময় ইয়ার্কি মারবিনে রন্টু, এই তোকে বলে দিলাম। চটে উঠল গণেশ, তাহলে কিন্তু—

—তোর মেজদাকে বলে দিবি, এই তো? হাসতে হাসতে জবাব দিল রঞ্জিত।

—এই তোকে লাষ্ট ওয়ার্নিং দিলাম। রুখে উঠল গণেশ।

তারপর কি ভাবে নিজেও হাসতে শুরু করে দিল মনের আনন্দে।

শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে কিন্তু গণেশের কাছ থেকেই আসল ব্যাপার জানা গেল।

ব্যাপার সত্যই গুরুতর। গণেশের কথিত সাহেব ছুটো সাধারণ ব্যক্তি নন। একজন বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ স্বয়ং মিঃ এফ, জে, লোম্যান, অন্যজন ঢাকার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ কুখ্যাত মিঃ ই. হড্‌সন,—ঢাকাতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধাতে যাঁর জুড়ি ছিল না।

পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। জল-পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেন্টে মিঃ বাড অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তিনি মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে রয়েছেন। হড্‌সনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান এসেছিলেন তাঁকে দেখতে।

বলাই বাহুল্য যে, এ উপলক্ষ্যে সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না। সর্বোপরি সাধারণ পোশাক-পরিহিত গুপ্তচরের দল যে কত ছিল, তা বোধ হয় গোণাগুনতি ছিল না।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ফেরার পথে হাসপাতালের সিঁড়িতে পা দিতেই পাশের দেবদারু গাছের আড়াল থেকে গর্জে উঠল মৃত্যু-দূতের পিস্তল।

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

লোম্যান সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। হড্‌সনও বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত, কারণ আঘাত গুরুতর। বাঁচলেও আজীবন তাঁকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে।

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি অস্বাভাবিক।

কাছাকাছি প্রতিটি লোক বিভ্রান্ত। প্রতিটি লোক দিশেহারা। কি যেন হয়ে গেল। বিশ্বাস করাও যেন শক্ত।

শুধু বিভ্রান্ত হলেন না সামনেই দাঁড়ানো সরকারী কণ্ট্রাক্টর সত্যেন সেন।

পুরষ্কার ও খেতাবের লোভে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুদূতকে জাপটে ধরতে গেলেন দুহাত বাড়িয়ে।

কিন্তু সব বৃথা।

কুস্তীর প্যাচে মৃত্যুদূত রীতিমত অভিজ্ঞ। তাই জাপটে ধরার আগেই তিনি আচমকা নীচে বসে পড়লেন ঝট্ করে। তারপরই চোয়াল লক্ষ্য করে বিরাট এক ঘুসি। ব্যস্, ঐ একটি মাত্র ঘুসিতেই খেতাব পাবার স্বপ্নসাধ শূন্যে মিলিয়ে গেল বীর পুঙ্গবের।

হৈ-চৈ শুনে বাগানের মালী ও ঠাকুর-চাকরদের মধ্যেও ছুটে এসেছিল কেউ কেউ। তবে মৃত্যুদূতকে ধরার চাইতে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারেই তাদের উৎসাহ বেশী দেখা গেল। ও তো পহেলে নম্বর ডাকু হ্যায়।

এদিকে মৃত্যুদূত তখন অদ্ভুত কৌশলে হাসপাতালের উঁচু পাঁচিলের উপর উঠে গেছে।

সামনেই একটা গৃহস্থ-বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক।

নিমেষেই মৃত্যুদূত জলের ট্যাঙ্কের উপর উঠে একবার সোজা হয়ে দাড়ালেন। তারপরই একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির অভ্যন্তরে। আর তাকে দেখা গেল না।

অন্যদিনের চাইতে অনেক আগেই গণেশ আর রঞ্জিত যে যার বাসায় গেল।

চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও তেমন নজরে পড়ে না। এমন কি ছোট ছোট শিশুগুলো পর্যন্ত কাঁদতে ভুলে গেছে কি এক অশুভ আশঙ্কায়।

গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা নিহত। আঘাতটাকে যে ব্রিটিশসিংহ নিঃশব্দে মেনে নেবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিঘাতটা এবার কোন্‌দিক থেকে আসবে কে জানে।

অনুমান মিথ্যে হল না।

পরদিনই গণেশ জানাল, জানিস, মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের পুলিশ বেধড়ক মার দিয়েছে। কাউকে বাদ দেয়নি। এত লোক জখম হয়েছে যে, হাসপাতালে আর জায়গা নেই।

—ওদের মেরেছে কেন? ক্ষুব্ধভাবে বললাম, ওরা তো আর লোম্যানকে মারেনি।

—পুলিশ তা শুনছে না। বলছে, ঘটনাটা যখন মেডিকেল স্কুলের মধ্যে ঘটেছে, তখন কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এর মধ্যে জড়িত আছে। নইলে ও সময়ে যে লোম্যান আসবে, লোকটা তা জানলে কি করে? নিশ্চয়ই এখান থেকেই কেউ জানিয়েছে। তাই তো পুলিশ ভালমন্দ

বিচার না করে সবাইকে পিটিয়েছে। অনেকেরই হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে। এমন কি হোষ্টেলে ঢুকে ছেলেদের সমস্ত জিনিসপত্র পর্যন্ত ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে।

আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল। সর্বনাশ। রাজপুত্তুরও যে ওখানে রয়েছেন। তার কোন ক্ষতি হয় নি তো!

মল্লিকা, মনটা ভারী হয়ে রইল সর্বক্ষণ।

ইচ্ছে হল এখুনি একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু সাহস পেলাম না।

প্রথমতঃ, তিনি নিজেই আমাকে আপাতত কিছুদিন ওখানে যেতে নিষেধ করেছেন, তদুপরি অভিভাবকের কড়া হুকুম,—পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত একমাত্র স্কুল ছাড়া আর কোন মতেই বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেই বা উপায় কি!

পরদিন গণেশ যা জানাল তা আরো আশঙ্কাজনক।

একটানা নির্মম প্রহারে জর্জরিত হয়ে কে নাকি একজন আততায়ীর নাম বলে দিয়েছে। সে নাকি তাকে নিজের চোখে গুলি করতে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কলেজ ম্যাগাজিন থেকে তার ছবির ফটো তুলে নিয়ে থানা, রেলষ্টেশন ইত্যাদি প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিতে শুরু করেছে, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

—কই, আমাদের এদিকে টাঙিয়ে দেয়নি তো! অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল রঞ্জিত।

—দেয়নি, দেবে। গণেশ নির্বিকার। মেজদা বললে,—সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, উয়াড়ী, বাংলাবাজার সব জায়গায় দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের এদিকেও হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

সেদিনই বিকেলের কথা। ছুটির পরে বাসায় ফিরে চলেছি। হঠাৎ তেরাস্তার মোড়ে দেওয়ালের গায়ে একটা পোষ্টার দেখে দৃষ্টিটা থমকে গেল।

উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'লোম্যানের হত্যাকারী। হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে মোট দশ হাজার টাকা পুরস্কার। পরিচয় গোপন রাখা হবে। নিকটস্থ থানায় খবর দিন।'

কিন্তু একি! পোস্টারের নীচের দিকে এ কার ছবি দেখছি!

ভাবলাম,—এ আমার অসুস্থ চিত্তের বিভ্রম, মায়া, দিবাস্বপ্ন। আবার চাইলাম পরিপূর্ণভাবে।

না, ভুল নয়! এতটুকুও ভুল দেখিনি আমি। এত কাছে থেকে ভুল হবার কথা নয়! ছবিটা আমার রাজপুত্তুরের।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কেবলি মনে হতে লাগল, চোখের সামনে যা দেখছি, তা কি সত্যি!

সে রাত্রে মোটেই ঘুম হল না।

ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী একটা অনুভূতিহীন আচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে যেতে লাগল রাত্রের প্রহরগুলো, আর সেই তন্দ্রাচ্ছন্নের মধ্যে বার বার চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে উঠতে লাগল রাজপুত্তুরের সেই প্রশান্ত দীপ্ত সদাহাস্যময় মুখখানি।

'সামনেই আমার সব চাইতে বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আমাকে পাশ করতেই হবে।'

চমকে উঠলাম। রাজপুত্তুরের কথা। শেষ বিদায়ের দিনে আমার প্রশ্নের উত্তরে ভাসা ভাসা স্বরে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন রাজপুত্তুর।

পাশ তিনি সসম্মানেই করেছেন। জীবনের সবচাইতে বড় পরীক্ষা দিতে গিয়ে এতটুকুও বিচলিত হন নি তিনি।

'আমার কাছে আর তুমি এসো না যেন। অন্ততঃ মাসখানেকের মধ্যে তো নয়ই।'

জানি রাজপুত্তুর। সে দিন তোমার মুখে এ-কথা শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম, আহত হয়েছিলাম।

কিন্তু আজ আর আমার এ-কথা বুঝতে বাকী নেই যে কেন তুমি সেদিন অমন করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে। আসলে আসন্ন বিপদ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল সেদিন তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

দেখতে দেখতে এক সময়ে অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। পূর্ব আকাশে দেখা দিল প্রত্যূষের রক্তরাঙা ইশারা।

প্রভাত-সূর্যের পানে দু'হাত জোড় করে অজ্ঞাতেই কখন মনে মনে বললাম,—রাজপুত্তুর যেন না ধরা পড়ে ঠাকুর। পুলিশ যেন কোনদিনই তার সন্ধান না পায়!

আশ্চর্য, সত্যিই সন্ধান পেল না। এত তৎপরতা, এত সতর্কতা সত্ত্বেও মানুষটা যেন হাওয়ায় মিশে গেল।

ফল হল মারাত্মক। ব্যর্থতার জ্বালায় পুলিশ যেন ক্ষেপে গেল। শুরু হল অত্যাচার আর নির্যাতন।

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে যোগ দিল শহরের নামী গুণ্ডার দল।

বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়, সুতরাং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজও বাদ গেল না। যেন তারাই স্বয়ং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ আর কি!

বিচিত্র এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। ইংরেজ কোনদিনও ওদের স্বজাতি বলে স্বীকার করে নি, আবার নিজ আভিজাত্যের গর্বে ভারতীয়দেরও ওরা আপনজন বলে মেনে নিতেও নারাজ। ফলে ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েই ওরা রইল চিরদিন।

তবে সেদিন কিন্তু ইংরাজ ওদের স্বীকৃতি দিতে এতটুকুও ইতস্তত

করল না। তদুপরি সঙ্গে গুণ্ডার দল তো আছেই। সুতরাং চালাও একতরফা মারপিট, গুণ্ডামী আর অত্যাচার। আর লুঠ কর মানুষের যথাসর্বস্ব। বিনয় বোসের নাম করে একটা মওকা যখন পাওয়া গেছে তখন এই সুযোগে যত পার হাতিয়ে নাও।

মল্লিকা, আন্দোলনকারীদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল বলে সেদিন তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই বাংলাদেশের বুকে ইংরেজ যা করেছিল, কোথাও তার তুলনা মেলে কি ?

কি করেনি সেদিন ইংরেজ ? মেয়েদের উলঙ্গ করে প্রহার করা, তাদের স্তন ধরে ওঠ-বোস করানো—কি সে করতে বাকী রেখেছিল !

সেদিনের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী শুনলে আজ বোধহয় তোমরা লজ্জায়, ঘৃণায় শিউরে উঠবে।

জানি, এ-কথা বিশ্বাস করতে তোমার মনে সংশয় জেগেছে। কারণ ইতিহাসে পড়েছ যে, ইংরেজ বীরের জাত। তদুপরি নারীর সম্মান রাখতে তাদের জুড়ি নেই।

আরো পড়েছ যে, বুড়ি বালামের তীরে নিহত বিপ্লবী বীর বাঘা-যতীনকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছিলেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সুতরাং ইংরেজ বীরের জাত না হয়ে যায় না!

স্রেফ ভণ্ডামী মল্লিকা, স্রেফ ভণ্ডামী।

ইংরেজ আর কিছু না জানলেও পাবলিসিটির ভড়ংটুকু খুব ভাল করেই জানে। তাই ক্ষুব্ধ জনসাধারণের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য সেদিন এই ভড়ংটুকু দেখানো তার প্রয়োজন ছিল।

নইলে যে চার্লস টেগার্ট সেদিন নিহত বাঘা যতীনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, তিনিই আবার স্বহস্তে চট্টগ্রামের বীর-বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে শ্রদ্ধেয়া সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে চড় মেরে

যখম করে দিয়েছিলেন,—এই জ্বলন্ত সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

আরো প্রমাণ চাও! প্রমাণ, বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্টেট-প্রিজনার ননীবালা দেবী।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য একদিন সুসভ্য ইংরাজসরকারের পুলিশ এই নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে লঙ্কাবাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

মল্লিকা, এবার তুমিই বল যে পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য রাষ্ট্রে এ ধরনের পাশবিকতার কোন নজীর আছে কি?

যে দক্ষিণআফ্রিকা বা পর্তুগীজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাদের কণ্ঠ প্রতি মুহূর্তেই সোচ্চারহয়ে ওঠে, তাদের পক্ষেও কোনদিন এতখানি কুৎসিত নির্যাতন করা সম্ভব হয়েছে কি?

ইংরেজের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয়েছিল। বীরের জাত কিনা!

যাক, রাজপুত্তুরের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

সেদিনের ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকার উপর দিয়ে নৃশংসতার একটা ঝড় বয়ে গেল যেন। কিন্তু যাকে নিে এত কাণ্ড, সেই রাজপুত্তুরের কিন্তু কোন খোঁজই পুলিশ পেল না।

তাহলে কোথায় গেলেন রাজপুত্তুর তিনি কি হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন? সেই কথাই এখন তোমাকে বলব:

হাসপাতালের প্রাচীর পেরিয়ে একটা গৃহস্থ বাড়ীর অভ্যন্তরে ঢুকল রাজপুত্তুর। তারপরই একেবারে সদর রাস্তায়। দিব্বি ভাল ছেলেটি। যেন কিছুই জানেনা আর কি।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় এখন! মেডিকেল মেসে!

উহুঁ, মেসে যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। ওখানে কেউ চিনে ফেলেছে কিনা কে জানে!

রিভলবার এবং পায়ের স্যাণ্ডেল দুটোই গেছে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে।

যাকগে। কি হবে আর রিভলবার দিয়ে। সবকটা গুলিইতো শেষ। ওটা থাকলেও আর কোন কাজে আসতো না।

কিন্তু এ ভাবে রাস্তায় থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। যেখানেই হোক, কোথাও যাওয়া প্রয়োজন। কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে?

ঠিক তখনই একটা খালি ঘোড়ার গাড়ী যেতেদেখে হাত দেখালেন রাজপুত্তুর।

—এই গাড়োয়ান, ভাড়া যাবে?

—যামুনা ক্যান্! সংগে সংগে রাশ টানল গারোয়ানটি,—কই যাইবেন মহারাজ?

—বক্‌সী বাজার।

—নেন, বইয়া পড়েন। পাঁচগণ্ডা পয়সা ধইরা দিয়েন।

—ঠিক আছে, চলো।

ঘোড়ার গাড়ী চেপে সোজা বক্‌সীবাজার,—মণি সেনের বাড়ী। মণি সেন দলেরই একজন।

সংগে সংগে তৎপর হয়ে উঠলেন মণি সেন। কিছুই তার বুঝতে বাকী নেই। সহকর্মী হিসেবে এখন তার সবচাইতে বড় কর্তব্য,—রাজপুত্তুরের নিরপত্তার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে কোনরকম ত্রুটি হলে চলবে না।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন কিছু টাকার। কিন্তু কার কাছে যাওয়া যায়। সামনেই ঢাকার সুপরিচিত বিপ্লবী নায়িকা শ্রীসংঘের অন্যতম পরিচালিকা লীলা নাগের (রায়) বাড়ী। তার কাছে একবার গেলে হয় না।

কিছুক্ষণ পরেই মণি সেন হাজির হলেন লীলা নাগের বাড়ী।

কিছু টাকা দিতে হবে লীলাদি।

দ্বিরুক্তি না করে প্রায় সংগে সংগেই কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন লীলাদি। এই নাও টাকা। যা করতে হয়, করো।

সারাদিন মণি সেনের বাড়ীতে। সন্ধ্যায় দলের অন্যতম নেতা সুপতি রায়ের মেসে।

কিন্তু রাত্রে! রাত্রে কোথায় রাখা যায় রাজপুত্তুরকে?

না, যেখানে সেখানে তাকে রাখাটা ঠিক হবে না। সর্বাগ্রে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন। সুতরাং সাবধানতার প্রয়োজন আছে বৈকি! নইলে বিপদ ঘটে যেতে কতক্ষণ।

কি করা যায় এখন! কোথায়, কার কাছে এখন রাখা যায় রাজপুত্তুরকে?

এগিয়ে এলেন আর এক বিনয় বোস। এগিয়ে এলেন বঙ্গেশ্বর রায়, নেপাল নাগ প্রমুখ তরুণবৃন্দ।

আপনি আদেশ করুন সুপতিদা। বলুন, কি করতে হবে আমাদের।

শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিলেন নতুন বিনয় বোস। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল সঙ্গতটোলার শশাঙ্ক দত্তের বাড়ীতে।

একজনের নয়, দুজনেরই। দুই বিনয়কেই আজ একসঙ্গে থাকতে হবে পাশা পাশি।

নিঝুম, নিস্তব্ধ রাত্রি। চারিদিক মৌন, অকম্পিত।

একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে দুই বিনয়। প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। মনে হয় গোটা পৃথিবীটাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে নিঝুম ঘুমের অতলান্তে।

শুধু ঘুম নেই নতুন বিনয়ের চোখে। চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না।

আসে রাশি রাশি চিন্তা। মাথার উপর কর্তব্যের গুরুভার।

দরকার হলে সারারাত জেগেও সে কর্তব্য তাকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে! সেখানে ঘুমের অবকাশ কোথায়?

আর রাজপুত্তুর! দিব্বি তিনি তখন ঘুমে অচেতন। সারামুখে তার নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি।

দেখে কে বলবে যে, এই পরম নিশ্চিন্ত মানুষটিই এতবড় একটা কাণ্ডের মহানায়ক।

ওদিকে তখন লোম্যান মার্ডারকে কেন্দ্র করে একটা ঝড় বয়ে চলেছে গোটা ঢাকা শহরের উপর দিয়ে।

জ্যোতিষ জোয়ারদার, শৈলেশ রায়, তেজোময় ঘোষ, মণি সেন, জটু ভাই, রমাপতি মিত্র, ভূপেন সরকার, গোপাল সেন, ভোলা বসাক, জীবন দত্ত, প্রভাত নাগ প্রমুখ অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন একে একে! উপায় কি? উপরওয়ালার কাছে কাজ দেখাতে হবে তো।

অবশ্য বিনয় বোসকে এখনো ধরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ধরাতো পড়ল বলে। শহরের সর্বত্র পুলিশের বেড়াজাল। সেই বেড়াজাল ডিঙিয়ে যাবে আর কোথায়!

বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! বৃষ্টি !

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। জলে থৈ থৈ করছে চারদিক। এমন কি কোন কোন জায়গায় ইতিমধ্যেই হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গেছে।

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই ছুটি গ্রাম্য মুসলমান হেঁটে চলেছে শহরের রাজপথ দিয়ে।

পরনে ছেঁড়া লুঙ্গী। গায়ে ময়লা গেঞ্জী। হাতে তালি-মারা জুতো। বেশ বোঝা যায় যে গাঁয়ের কোন গরীব মুসলমান। বোধহয় মামলা করতে শহরে এসেছিল। এবার ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে চলেছে।

কিন্তু ঐ পিছনের লোকটিকে একটু যেন কেমন কেমন মনে হয় না মল্লিকা ? ওর চাল-চলন, ভাবভঙ্গী সব কিছুই যেন বড্ড বেমানান।

রাজপুত্তুর। নিশ্চয়ই রাজপুত্তুর। আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে, উনি রাজপুত্তুর ছাড়া কেউ নন।

অমন বলিষ্ঠ দেহ, আর ভুবন-ভোলানো রূপ কি এত সহজে লুকানো যায়।

কিন্তু কি দুর্জয় সাহস তোমার রাজপুত্তুর ! ঐ দেখ, এখনো তোমার ছবি টাঙানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে। মাথার দাম ধার্য হয়েছে তোমার দশ হাজার টাকা। তা সত্ত্বেও তুমি রাস্তায় বেরুলে কোন সাহসে !

তোমার চারিদিকে হিংস্র হায়েনার চোখ। মশা-মাছি পর্যন্ত আজ ওদের চোখকে এড়াতে পারে না। পারবে কি তুমি ওদের শক্ত বেড়াজাল ডিঙিয়ে ওপারে যেতে ?

হ্যাঁ, তুমি পারবে। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তুমি পারবে। পারতেই হবে।

ইতিহাসের নায়ক তুমি। তোমার ইতিহাস সবে তো মাত্র শুরু। এর শেষ অধ্যায়টিও যে তোমাকে নিজের হাতেই লিখে যেতে হবে।

বিকেল হয়ে এসেছে তবু বৃষ্টির এতটুকু বিরাম নেই। পথ-ঘাট ধুয়ে মুছে সব একাকার।

সামনেই দোলাইগঞ্জ স্টেশন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হলে এটাই ঢাকার পরবর্তী রেলস্টেশন।

ঐ দেখ মল্লিকা, গাঁয়ের সেই সহজ সরল লোক দুটি স্টেশনে ঢুকে গেল।

কিন্তু একি! পুলিশ যে গিজ গিজ করছে স্টেশনের সর্বত্র। সাদা পোশাকে টিকটিকির দলও কিছু কমতি নেই।

তাছাড়া এখানেও টাঙানো রয়েছে রাজপুত্তুরের অসংখ্য ছবি। যদি ধরা পড়ে!

না, পড়বে না। রাজপুত্তুরকে ধরার সাধ্য ব্রিটিশ পুলিশের নেই। সে আলাদা ধাতুতে তৈরি।

সিগন্যাল ডাউন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জগামী গাড়ী আসার সময় হয়েছে।

কিন্তু না, যাত্রীদের আপাতত প্লাটফরমে যাবার হুকুম নেই। আগে প্রতিটি কামরা তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হবে, তারপর ওরা যেতে পারবে।

প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হল। এমন কি কামরার পায়খানাগুলোতে পর্যন্ত তল্লাসী চালানো হল। খোলা মালগাড়ি-গুলোও বাদ গেল না।

কিন্তু কোথায় বিনয় বোস?

না, এ গাড়িতে সে নেই। এবার যাত্রীরা গাড়ীতে উঠতে পারে।

ওদের কাণ্ড দেখে ওয়েটিং-রুমের এককোণে বসে তুমি হাসছ

রাপুজত্তুর! ধন্যি ছেলে বাপু! যাক্, হুকুম হয়েছে। এবার গাড়িতে ওঠ গিয়ে।

ছদ্মবেশী দুই বিনয় গাড়ীতে উঠে বসলেন পরম নিশ্চিন্তে।

সংগে উঠলেন আরো দুজন। বঙ্গেশ্বর রায় আর বকুল দাশগুপ্ত।

সুপতিদার নির্দেশ, রাজপুত্তুরকে নির্বিঘ্নে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

আর উঠলেন গিরিজা সেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গিরিজা সেন। থাকেন নারায়ণগঞ্জে। তাদেরই বাড়ীতে আজ থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে রাজপুত্তুরের। সুপতিদার নির্দেশ তাই।

পূর্ণবেগে গাড়ি ছুটে চলেছে ফতুল্লার দিকে।

কামরার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে সেই গ্রাম্য লোক দুটি। মুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য। চোখে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি। বোধহয় কোর্টে মামলা শেষ করে কতক্ষণে বাড়ী গিয়ে বিবির মুখ দেখতে পাবে সে-কথাই ভাবছে ওরা মনে মনে।

কামরার অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদঙ্গল ছেলে। হৈ-চৈ করে বলতে গেলে গোটা কামরাটাকেই ওরা একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে! বেশ বোঝা যায় যে, ছুটির পরে মনের আনন্দে ওরা ঘরে ফিরে চলেছে।

তুমি নিশ্চিন্ত থাক রাজপুত্তুর। ওরা তোমার এতটুকু ক্ষতি করবে না।

বিশ্বাস কর, এই মুহূর্তে ওদের চাইতে বড় বন্ধু তোমার আর কেউ নেই। তোমার জন্যই তো ওরা পার্টির নির্দেশে এ গাড়িতে উঠেছে, তোমাকে নির্বিঘ্নে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে দেবে বলে।

মল্লিকা, রাজপুত্তুর যে ঐ গাড়ীতেই যাচ্ছেন, সেকথা কি সেদিন

একবারও বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দলীয় সদস্যদের ? ওরা কি সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পেরেছিলেন সেকথা ?

কক্ষনো না। কারণ, সেই মন্ত্রগুপ্তি। কে-কি-কেন কোন প্রশ্ন নয়। শুধু নিঃশব্দে এগিয়ে যাও।

সদস্যদের শিক্ষাও ছিল ঠিক তেমনই। তারাও সেই মন্ত্রগুপ্তিকে মেনে চলতেন অক্ষরে অক্ষরে। কারণ, তারা জানতেন যে, বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। ফাঁসি ও দ্বীপান্তর, এর মাঝামাঝি সেখানে কোন রাস্তা নেই। সুতরাং মন্ত্রগুপ্তি অপরিহার্য্য।

চাষাড়া স্টেশন।

চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তদুপরি ঝড়-জল-বৃষ্টি তো আছেই।

মাত্র এক মিনিটের বিরতি।

গাড়ি আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। এর পরের স্টেশনই নারায়ণগঞ্জ।

হঠাৎ বাইরে তীক্ষ্ণ শিষ দেবার শব্দ।

ডেঞ্জার সিগন্যাল। গেট-আপ্। রেডি। কুইক। নিমেষে গোটা কামরা ফাঁকা।

চোরের উপর বাটপাড়ি। গোয়েন্দার পিছনে গোয়েন্দা।

ঢাকা থেকে খবর এসেছে এ-গাড়ি নারায়ণগঞ্জে আবার সার্চ করা হবে।

শুধু গাড়িই নয়, প্রতিটি স্টিমার, লঞ্চ, বজরা, পানসী তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হবে।

এ-পক্ষের গোয়েন্দা খবরটা ধরে ফেলেছে। সুতরাং গাড়ির পালা এখানেই ইতি। এখান থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব সামান্যই। চল এবার পয়দলমে।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুপতি রায়। আগে থেকেই তিনি এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন সবার জন্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সবাই নির্বিঘ্নে এসে গেছে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ।

এবার বঙ্গেশ্বর রায়, বকুল দাশগুপ্ত ও নতুন বিনয়ের ছুটি। তাদের কর্তব্য শেষ। আবার তাদের এখন ফিরে যেতে হবে ঢাকাতে।

বঙ্গেশ্বর, বকুল ও নতুন বিনয়কে বিদায় দিয়ে সবাই এবার এগিয়ে চললেন গিরিজা সেনের বাড়ীর দিকে। ওখানেই আজ রাত কাটাতে হবে সবাইকে। পরবর্তী প্রোগ্রাম শুরু হবে কাল ভোরে।

'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আর নৌকা বাইতে পারি না।'

মাঝি মনের আনন্দে গান গেয়ে তার ডিঙি বেয়ে চলেছে শীতলক্ষার বুক বেয়ে। ভেতরে দুটি মাত্র প্রাণী। বেশ বোঝা যায় তারা গাঁয়ের সহজ সরল লোক। বোধহয় কুটুমবাড়ি চলেছে।

এপারে নারায়ণগঞ্জ, ওপারে বন্দর।

বন্দর আসলে কোন সত্যিকারের বন্দর নয়, জায়গাটার নামই বন্দর।

মাঝির লক্ষ্য আপাততঃ বন্দরের দিকেই।

কিন্তু ওহে মাঝির পো, তোমার কোমরের দিকের কাপড়টা অমন উঁচু হয়ে রয়েছে কেন? কি লুকিয়ে রেখেছো ওখানে?

থাক বাপু, তোমাকে আর সামলাতে হবে না। তুমি যে কি চীজ তা বোঝা গেছে।

যাও, নির্বিঘ্নে ওদের ওপারে পৌঁছে দিয়ে এস। তবে এদিক-ওদিক কিছু হলে তখন কিন্তু ঝট্ করে কোমরের নীচে হাত দিতে দেরি করো না।

বন্দর থেকে পায়ে হেঁটে বৈদ্যের বাজার।

আবার নৌকা।

তবে এবার আর কোমরের কাপড় যাদের উঁচু হয়ে থাকে, সে-সব মাঝি নয়, সত্যিকার মাঝির নৌকা। মেঘনা পাড়ি দিতে হবে।

যাত্রীও সেই দুজনই। তবে এরা আলাদা লোক।

মিয়া সাহেবদের বদলে এবার এসেছেন অন্য দুটি প্রাণী। জমিদার-বাবু আর তাঁর ভৃত্য। বোধ হয় কোন মহাল বা কাছারী পরিদর্শন করতে চলেছেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর রাত্রি।

অশান্ত মেঘনা। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ভাঙা-গড়ার শব্দ চলেছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

দেখতে দেখতে এক সময়ে মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠলো আকাশটা। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল মাঝির মুখ।

গতিক সুবিধার নয়। মেঘনা আজ প্রায় সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল মেঘনার সে কি বিচিত্র রূপ! সে কি তার নাচের ঘটা!

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু'বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহূর্মুহু সে আঘাত করতে লাগল নৌকোর নড়বড়ে কাঠের খোলটার উপর। যেন নিজ রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল সমাধিতে না পাঠানো পর্যন্ত কোন রকমেই শান্তি নেই তার।

—আর পারলাম না কর্তা। হতাশ ভাবে বলল মাঝি, বাঁচতে হইলে আবার ঘাটের দিকে নাও ফিরাইতে হইব।

—কি সর্বনাশ। জমিদারবাবুর সারা মুখে চিন্তার কালো রেখা, আমার যে অনেক কাজ পড়ে আছে। যেমন করে হোক, আমাকে পার করে দাও মাঝি। তুমি বরং বেশি পয়সা নিও।

—পয়সা! জানই যদি চইলা যায় তো পয়সা দিয়া কি করুম।

এই ঝড়-তুফানে মেঘনা পাড়ি দিতে আমি ক্যান, আমার বাপে আইলেও পারবনা।

—তাই তো! চিন্তিত হয়ে পড়লেন জমিদারবাবু। এখন উপায়! কি করা যায় এখন?

—কেন, অত চিন্তার কি আছে? মাঝি উপায় বাতলে দিল, অত যখন জরুরী কাম, তখন জাহাজে চইলা যান। সামনেই ফিলেগ ইস্টিশন। কন্ তো ইস্টিশনে তুইলা দিয়া আসি। একটু পরেই জাহাজ আইব।

অগত্যা তাই। শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন জমিদারবাবু!

উপায় কি! অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়েছে। মহালে গিয়ে টাকাগুলো তুলতে হবে তো।

স্থায়ী কোন স্টেশনে নয়, একটা অস্থায়ী ফ্ল্যাগ-স্টেশন মাত্র।

তবে আশার কথা এই যে এখানে পুলিশের কোন সমারোহ নেই। বিনয় বোসের মত একটা ডেঞ্জারাস ছেলের এখানে আসার কোন কারণ নেই। আর পুলিশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আসবেই বা কি করে? সুতরাং পুলিশ রেখে লাভ কি!

স্টিমারটা একটানা ছুটে চলেছে মেঘনার ঢেউ ভেঙে। লক্ষ্য তার ভৈরবের দিকে।

না, সপারিষদ জমিদারবাবু উধাও হয়েছেন। পরিবর্তে এসেছেন আমাদের পূর্বেকার চেনা সেই সহজ গ্রাম্য মুসলমান দুটি।

স্টিমারে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর ভীড়। এই ভীড়ের মধ্যে জমিদার-বাবুটি সেজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ নেই। তার চাইতে আগেকার বেশই ভাল।

যথাসময়ে ভৈরব। এবার ট্রেণ।

স্টেশনে পুলিশ অবশ্য রয়েছে, তা থাক না। এই ক'টা পুলিশের মহড়া নেবার মত ক্ষমতা রাজপুত্তুরের নিশ্চয়ই আছে।

বিশেষ করে সঙ্গে রয়েছেন একই পথের পথিক সদাসতর্ক ঐ সঙ্গীটি।

লোক হিসেবে তিনি কিছু কম নন। প্রয়োজন হলে চোখের নিমেষে ধাঁই করে একখানা মেরে দিতে তিনিও বড় কম যান না।

বিশেষ করে বর্তমান ক্ষেত্রে তো নয়ই! মাথার উপর কর্তব্যের গুরুভার। যেমন করে হোক, পুলিশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে রাজ-পুত্তুরকে নিরাপদে শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

পিছিয়ে গেলে চলবে না। দরকার হলে যুঝতে হবে। সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে। তবু আত্মসমর্পণ কোন মতেই নয়। সুতরাং বলতে গেলে পিস্তলের ট্রিগার তাঁর সর্বক্ষণ মাথা উঁচিয়েই আছে। শুধু নেমে আসবার অপেক্ষা মাত্র।

মল্লিকা, রাজপুত্তুরের ঐ সঙ্গীটির কি নাম, বৃত্তান্ত—আজকের কাহিনীতে সে-কথা উহ্যই থাক। ধরে নাও সে-দিন রাজপুত্তুরের সঙ্গী ছিলেন কোটালপুত্র।

তাছাড়া কোটাল তো তিনি বটেই। দুষ্টের দমন করা ও তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই তো কোটালের কাজ। সেদিক থেকে এ কাহিনীতে কোটালপুত্র নাম তাঁর সার্থক। তবু চুপে চুপে তোমাকে বলে রাখছি,—নাম তাঁর সুপতি রায়। বিখ্যাত বিপ্লবী সুপতি রায়।

চমক ভাঙল কিশোরগঞ্জ গিয়ে।

সর্বনাশ! সারাটা প্ল্যাটফরম জুড়ে লালপাগড়ির বেষ্টনী। গাড়ি নাকি সার্চ হবে।

এখন উপায়! ইতিহাসের শেষ পর্বের যে এখনো অনেক বাকী। এরই মধ্যে কি ভরাডুবি হবে?

জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে একজন রেলওয়ে টি. টি.। একগাল পান চিবোতে চিবোতে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি কি দেখেছিলেন, কে জানে !

সঙ্গে সঙ্গে দুই মিয়াসাহেব গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে,—কর্তা একটা আকাম কইরা ফালাইছি। এইবারের মত আমাগো পোলাপানগো মাপ কইরা দেন।

—কি হয়েছে ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন টি. টি.।

—আর কন্ ক্যান্। তাড়াতাড়ি কইরা গাড়িতে উঠতে গিয়া টিকেট কাটতে পারি নাই। অখন আমাগো ক্ষেমাঘেন্না কইরা দুইখানা টিকিটের ব্যবস্থা কইরা দেন। নইলে অমোগো পুলিশে ধইরা লইয়া যাইব। দেখছেন না, কেমন চোখ পাকাইয়া চাইয়া দেখতে আছে।

—দূর পাগল ! হেসে বললেন টি. টি. ওসব তোদের জন্য নয়।

—না না, অগো বিশ্বাস নেই। ওরা বেবাক পারে। তার থিকা আপনে আমাগো নিজের হাতে দুইখানা টিকেট কাইটা দেন। আমরা টাকা দিতে আছি। আপনেরেও কিছু দিমু।

—কোথাকার টিকেট চাই ? প্রশ্ন করলেন টি. টি.।

—খাইছে, জায়গার নাম তো মনে নাই। মগবুল চাচায় কি যেন কইছিল, হালার বেবাক ভুইলা গেছি। সবুর করেন, মনে কইরা কইতে আছি। হ' হ' মনে হইছে। কইলকাতা। কইলকাতা। ঐখানে গিয়া আমরা কাপড়ের কলে কাম করুম। নেন, আর দেরী কইরেন না। আপনার চরণ ধরি। লন যাই টিকেট-ঘরে, আমরাও আপনের লগে যাইতে আছি।

মল্লিকা, দিব্বি দু'জনে টি. টি-র পেছনে পেছনে টিকেট-ঘরের দিকে চলে গেলেন ব্রিটিশ পুলিশকে ভাঁওতা দিয়ে।

ওরা দেখেও দেখল না। কেনই বা দেখবে। টি. টি-র হাতে রোজ এমন কত বিনে-টিকেটের যাত্রীই তো ধরা পড়ে। এরাও তাই হবে হয়তো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দু'জন ফিরে এলেন মুখে একগাল হাসি নিয়ে। এদিকে তল্লাশী তখন শেষ, সুতরাং গাড়ীতে উঠতে আর কোন বাধা নেই।

মজা হল ময়মনসিং-এ।

ঘণ্টা পড়েছে। গাড়ি ছাড়বে এবারে। কামরার অর্ধেকটাই প্রায় ফাঁকা। সুতরাং আয়েস করে এখন একটু বসা যেতে পারে।

কিন্তু একি! বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সহসা তীরবেগে কামরায় ঢুকলেন একজন দারোগা সাহেব। সঙ্গে জনকয়েক পুলিশ কনস্টেবল।

রেডি রাজপুত্তুর, রেডি। ইয়েস আমি প্রস্তুত।

কিন্তু না, ওরা গাড়ি সার্চ করতে আসেনি। কোথায় যেন কি উপলক্ষ্যে চলেছে ওরা। দৈবক্রমে এ কামরায় উঠেছে মাত্র।

মল্লিকা, সঙ্গে সঙ্গে দুজনের অন্য চেহারা। একজন ছেঁড়া কাঁথায় নিজেকে ঢেকে নিমেষে কামরার মেঝেতে শুয়ে লম্ববান, অন্যজন দু'-হাত জোড় করে অদূরে দণ্ডায়মান একান্ত অনুগত ভৃত্য 'কেষ্ট'র মত।

গাড়ী স্পীড্ নিয়েছে। দারোগা সাহেবও ততক্ষণে বেশ জমিয়ে বসেছেন দলবল নিয়ে। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, আপাততঃ তিনি জগন্নাথঘাটে চলেছেন মস্তবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে।

তখনকার দিনের দারোগা, সুতরাং দাপট সাংঘাতিক। সিপাইদের লক্ষ্য করে সে কি তাঁর হম্বিতম্বি।

আসুক না বিনয় বোস। আমিও জগন্নাথঘাটে গ্যাট হয়ে বসে আছি। চেনে না তো আমাকে। ক্যাঁক করে বাছাধনের টুঁটি চেপে ধরব না! এই তেওয়ারী বন্দুকে সব সময় গুলি ভরে রাখবি। বিশ্বাস নেই বেটাকে। হয়তো ধাঁই করে একখানা মেরে হড্‌সনের মত কোমর ভেঙে দেবে। আমার আবার 'হাটের' ব্যামো। তাইতো এই নতুন মাদুলীটা নিতে হল।

এ কি! নিমেষে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন দারোগাসাহেব, বন্দুকের নলটা আবার আমার দিকে ধরে রেখেছিস্ কেন! ওটা একটু ঘুরিয়ে রাখ না বাপু। বলছি আমার হার্টের ব্যামো। এ-সব ধকল কি আমার সয়!

হঠাৎ কোটালপুত্রকে দেখে চমক ভাঙল দারোগাসাহেবের।

তাই তো! এ লোকটা কে? সেই কখন থেকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেই বা কেন?

—কিরে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দারোগাসাহেব, অমন ঘোড়ার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে। ওদিকে বসলেই তো পারিস।

—পোলাপানের মত কি যে কন হুজুর! বিনয়ে একেবারে গলে গেলেন কোটালপুত্র,…আপনে হুকুম না দিলে কি আমরা বইতে পারি! বেয়াদপী হইব না!

খুশি হলেন দারোগাসাহেব। হ্যাঁ এই তো চাই। আহা, বিনয় বোসটা যদি এরকম লক্ষ্মীছেলে হত, তাহলে এমন হার্টের ব্যামো নিয়ে আর এভাবে দৌড়-ঝাঁপ করতে হত না তাকে।

—ঠিক আছে, তুই বোস ওদিকে। নিমেষে সদয় হয়ে উঠলেন দারোগাসাহেব,—আমি তোকে বসতে হুকুম দিলাম। তা, তোর পায়ের কাছে ওটা আবার কে কাঁথা-চাপা দিয়ে শুয়ে আছে?

—আর কন ক্যান্ হুজুর। প্রায় কেঁদে ফেললেন কোটালপুত্র,—আমার চাচাতো ভাই নুরমিয়া। জ্বরে একেবারে বেহুঁশ। আল্লার মনে কি আছে কে জানে!

এঁ্যা! একে হার্টের ব্যামো, তার উপর কিনা এসব জ্বরের রোগী! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে নিমেষে কামরার অন্য প্রান্তে সরে গেলেন দারোগাসাহেব।

কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দিনকাল ভাল নয়। জ্বর যখন হয়েছে তখন মায়ের দয়া হতেই বা কতক্ষণ। না বাপু, এসব

রোগ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। বিশেষ করে এই হাটের ব্যামো নিয়ে।

একি? ছেঁড়া কাঁথার নীচে শুয়ে তুমি ফিক্ ফিক্ করে হাসছ রাজপুত্তুর।

নাঃ! এই হাসিটাই দেখছি তোমার কাল হয়ে দাঁড়াবে। তবে আর যাই কর বাপু, ঐ দারোগাবাবুটির দিকে যেন তুমি নজর দিয়ো না। বেচারার আবার হাটের ব্যামো।

জগন্নাথঘাট। এ লাইনে এটাই শেষ স্টেশন। এবার স্টিমার।

নিজের পদমর্যাদা জাহির করে দলবল নিয়ে সর্বাগ্রে নেমে গেলেন দারোগাসাহেব।

সবশেষে কোটালপুত্র নামলেন তাঁর অসুস্থ চাচাতো ভাই নুর মিয়াকে নিয়ে। ছন্নছাড়া বিহঙ্গের মত অসহায় ভাব।

হবেই তো। বেচারার চাচাতো ভাইটির একে জ্বর, তার উপর আবার বসন্ত। আল্লার মনে কি আছে কে জানে!

স্টিমারটা সাতার কেটে চলেছে জলের উপর দিয়ে। একেবারে লক্ষ্য সিরাজগঞ্জ ঘাট। দূরত্ব সামান্যই।

তিনদিন পেটে কোন আহার পড়েনি। আজও যে পড়বে তেমন কোন ভরসা নেই।

কষ্ট! না, কষ্ট কিসের! পরাধীনতার নাগপাশ যাঁরা ছিন্ন করতে চায়, সেই সব ঘরছাড়া হতভাগ্যের দল জানে যে, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

এ পথ চিরদিনই দুর্গম ও ক্ষুরধার। এ পথে যাঁরাই চলেছেন, তাঁদের সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা।

পদে পদে তাঁরাই হয়েছেন লাঞ্ছিত, অপমানিত ও জর্জরিত। সুতরাং সামান্য এই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য তাঁদের বিচলিত হবার কথা নয়।

বিচলিত হলেন কোটালপুত্র। হলেন রাজপুত্তুরের কথা ভেবেই।

এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। অদ্ভুত ওর সাহস। অসাধারণ ওর দক্ষতা। নির্ভুল ওর নিশানা।

অদূর ভবিষ্যতে এর চাইতেও অনেক বড় সংগ্রামে ওর মূল্যবান অধিনায়কত্বের প্রয়োজন। সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মত রুখে দাঁড়াতে হলে ওকে সুস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবে দরকার। সুতরাং নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন। এখনই প্রয়োজন। পরে যে সুযোগ পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

স্টিমারে একমাত্র উপায় বাটলার। তবে প্রথম শ্রেণীর সাহেব-সুবো নিয়ে তার কারবার। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথায় সে কি রাজী হবে?

দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। কনস্টেবলকে 'হাবিলদার সাহেব' বলে আপ্যায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

এই যে! এক গাল হেসে বাটলারের কেবিনের দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালের কোটালপুত্র, আপনেই বুঝি এই লাইনের বাটলার সাহেব?

—হ্যাঁ, কেন? বাটলার নিজের পদমর্যাদায় গম্ভীর।

—না কিছু না। আমাগো সাহেব আপনের কথা অখনো প্যাচাল পারে। কয় যে, জগন্নাথঘাট লাইনের বড় বাটলার সাহেবের হাতে যে খাওয়া একবার খাইছি, তা বিলাতেও কোনদিন খাই নাই। যেন জন্মের শেষ খাওয়া।

—কোন্ সাহেব? প্রশ্ন করে বাটলার।

—ক্যান্ আমাগো চটকলের সাহেব। এই ত' গত চৈত্ মাসে আপনের হাতে খাইয়া গেল। আপনের মনে নাই?

সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে বাটলার। কি জানি। হয়তো হবে। এমন কত সাহেবই তো এ লাইনে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কে যে কোন্ কোম্পানির সাহেব, তা কে আর মনে রাখতে গেছে।

—তা, কইছিলাম কি, আমাগো দুইজনেরেও কিছু দেন না কেনে। এত যখন নাম তখন একটু চাইখা দেখি। না না, আপনার কোন ক্ষেতি করুম না। পয়সা যা লাগে দিমু।

আর কোন আপত্তি করল না বাটলার সাহেব। কেনই বা করবে? এই হাবা-গবা লোক দুটোর কাছ থেকে যদি বেশ কিছু হাতিয়ে নেয়া যায় তো মন্দ কি!

জগন্নাথঘাট থেকে স্টিমার সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ থেকে রেলে সোজা শিয়ালদা স্টেশন।

কিন্তু না, শিয়ালদা নয়। দমদমেই মিয়াসাহেবেরা নেমে গেলেন গাড়ি থেকে।

শিয়ালদা অনেক বড় স্টেশন। সংবর্ধনার আয়োজনটাও হয়তো বড়রকমই থাকবে। কি লাভ। তার চাইতে ছোট স্টেশন দমদমই ঢের ভাল। এবার মগবুল চাচার সেই কাপড়ের কলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কি!

—ভাবনার কারণ আছে বৈকি! স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মন্তব্য করলেন কোটালপুত্র, তবে ভাবনা শুধু একটি লোককে নিয়েই। লোকটা শেয়ালের চাইতেও ধূর্ত। যেন গন্ধ শুঁকে সব টের পায়। যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, খুঁজে খুঁজে ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হবে।

—তা যদি হয় তো ভালই হবে। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল রাজপুত্তুর, দেখো আমাদের গুলি কোনদিনও মিস্ হবে না।

—তা জানি। হেসে বললেন কোটালপুত্তুর, তবে মুশকিল কি জান, একদিক থেকে বিচার করতে গেলে লোকটা অনেকটা আমাদের মতই। মৃত্যুকে সে মোটেই ভয় পায় না। বরং যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা, সেখানে ঝাপিয়ে পড়তেই যেন ওর যত কিছু আনন্দ।

ওকে সমীহ না করে উপায় নেই।

—কে সে লোকটা? প্রশ্ন করলেন রাজপুত্তুর।

—চার্লস টেগার্ট।

কথাটা বলেই হাসলেন কোটালপুত্তুর।

পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট যে কি চীজ তা তিনি হাড়ে হাড়েই জানেন। শুধু তিনি কেন, দলের কারোরই বোধহয় জানতে বাকি নেই।

তবে বিনয়ের কথা আলাদা। সে ভিন্ন ধাতুতে তৈরি।

অদ্ভুত তাঁর ক্ষিপ্রতা। অসাধারণ তাঁর কর্মদক্ষতা। দেখা যাক ইস্পাতের মত অনমনীয় এই প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে টেগার্টকে সে তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে কিনা।

নাটক এবার জমবে ভাল। যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেন।

গোটা একতালাটা জুড়ে রিক্সা ও মোটর-গ্যারেজ। যেমনি ঘিঞ্জি তেমনি অন্ধকার।

বারো ঘর এক উঠান। নানাজাতীয় লোকের বাস। পঞ্চনদ থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। হৈ-হল্লা সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

দোতলাটা ঠিক বিপরীত। বেশ প্রশস্ত ও মোটামুটি সুসাজ্জিত। পরিবেশের দিক থেকেও অনেকটা শান্ত।

দোতলায় একটি কক্ষে চুপচাপ বসে আছেন কয়েকটি যুবক। চোখে-মুখে তাদের অধীর প্রতীক্ষা।

বেশ বোঝা যায় যে, কারো জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন।

অনুমান মিথ্যা হল না।

মুহূর্ত বাদেই অসুস্থ চাচাতো ভাই নুরমিয়াকে নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে পা দিলেন কোটালপুত্র। সারা মনে তাঁর কূলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি।

যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল, তাতে তিনি ব্যর্থ হননি। দায়িত্ব তাঁর এখানেই শেষ। আপাততঃ কিছুদিন তাঁর ছুটি।

আনন্দে, আবেগে ততক্ষণে সবাই অসুস্থ চাচাতো ভাই নুরমিয়াকে টেনে নিয়েছেন বুকের মধ্যে। ধন্য বিনয়, সত্যিই তুমি ধন্য। যে খেলা তুমি দেখিয়েছ, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

না, আর নুরমিয়া নয়। নুরমিয়ার খেলা শেষ। তাই দেখতে দেখতেই নুরমিয়া এবার হয়ে উঠলেন খাঁটি একজন বর্মীজ মুসলমান।

দেখে কে বলবে যে, আগাগোড়া বর্মীজ পোশাক পরা মানুষটির আড়ালে যিনি রয়েছেন, তিনি আসলে শাসকদের ঘুম কেড়ে নেয়া দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিনয় বোস ছাড়া আর কেউ নন।

কিন্তু এ আস্তানায় বেশি দিন থাকা উচিত নয়। জায়গাটা শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নীচে বহুলোকের আনাগোনা। কার মনে কি আছে, কে জানে!

এ অবস্থায় উলুক মুলুক সাহেবের মত রইস্ আদমীর এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

টেগার্ট সাহেবের নজরে পড়ে যেতে কতক্ষণ।

আশ্চর্য লোক ঐ টেগার্ট সাহেব। মাত্র দিন কয়েক আগে ওর উপর বোমা পড়েছে, কিন্তু ঠিক বেঁচে গেছে লোকটা।

এখনো তার জের মেটেনি। ধরপাকড় সমানেই চলেছে। নেকড়ের মত চোখ নিয়ে ও যে এখানে এসেও হানাদেবে না, তা কে বলতে পারে।

অবশ্য এখানে সবাই সশস্ত্র। রুখে দাঁড়াবার মত সাহসেরও তাদের অভাব নেই। তবু অকারণে শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই।

সামনে দীর্ঘ বিসর্পিল পথ। এখনো দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে। এমন আঘাত হানতে হবে,—যার ফলে গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। সুতরাং এখানের বাস তুলে চলে যাও কাতরাসগড় কলিয়ারিতে। সেখানেই থাকো কিছুদিন।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! সর্বত্র রাজপুত্তুরের ছবি ছড়ানো। এ অবস্থায় প্রকাশ্যে পথ চলাও যে বিপদজনক।

বিপ্লবীদের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। সুতরাং হার মানলে চলবে না। দেখা যাক, কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা!

অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার দায়িত্ব নিলেন প্রবীণ নেতা, ঐতিহাসিক রডা-অস্ত্রলুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক হরিদাস দত্ত।

প্রথমেই তিনি দলের নিজস্ব একটি গাড়ীতে করে রাজপুত্তুরকে

নিয়ে গেলেন চুঁচুড়ায়। ওখানে তাঁর ভাগ্নি রয়েছে। ভাগ্নি-জামাই সরোজ রায় হুগলীর জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা প্রয়োজন।

সেদিনই রাত্রের কথা।

ব্যাণ্ডেল জংশন। কলকাতা থেকে গাড়ী আসার সময় হয়েছে।

স্টেশনে পাহারারত পুলিশবাহিনী প্রস্তুত। উপরওয়ালার নির্দেশ, কলকাতা থেকে বাইরে যাবার প্রতিটি গাড়ীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ডেঞ্জারাস ছেলে বিনয় বোস যেন কোনরকমেই বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে।

সহসা কি দেখে পুলিশবাহিনী তটস্থ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাইভেট গাড়ী হঠাৎ এখানে কেন? তবে কি হুজুর কোন কাজে বাইরে যাচ্ছেন এ গাড়ীতে?

না, হুজুর নন, তাঁর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সরোজবাবু। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন। তাঁর কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হয়তো।

—সেলাম বাবুজী।

—সেলাম। বেশ রাশভারি চালে জবাব দিলেন সরোজ রায়, বেশ ভাল করে ডিউটি দাও। আসামীকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, তা মনে রেখো।

আশ্চর্য! যাঁকে ধরবার জন্য এত আয়োজন, দিব্বি তিনি চলে গেলেন পুলিশের নাকের উপর দিয়ে। পুলিশ কিছু টেরই পেলনা।

কলকাতা থেকে কাতরাসগড় কোলিয়ারী। আশ্রয় নিলেন দলীয় বন্ধু—অনাথবন্ধু দাসের কোয়ার্টারে।

খুশি হতে পারলেন না রাজপুত্তুর। সবে তো শুরু। এখানেই কি তার কর্তব্য শেষ! না, মনটা যেন ঠিক সায় দেয় না।

তাই শেষ পর্যন্ত আবার কলকাতায়। প্রথমে সেই সাতনম্বর ওয়ালিউল্লা লেনে, তারপর বেলেঘাটায়। জায়গাটা অনেকটা নিরাপদ। নিরিবিলিও বটে।

ঢাকায় তখনো পুরোদমে পুলিশী তাণ্ডব চলেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ-সিংহ।

বিনয় বোসের শির চাই। নইলে ইজ্জত আর থাকবে না।

কিন্তু কোথায় বিনয় বোস!

আশ্চর্য, লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। সর্বত্র তাঁর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় হানা দেওয়া হয়েছে। ধরপাকড়, মারপিট, লুঠতরাজ কিছুই বাকি নেই, কিন্তু সব বৃথা। কোন খবর নেই।

গেল কোথায়?

পুলিশের এই দৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। ভেল্কি-টেল্কি জানে নাকি লোকটা?

ঠিক তখনই একদিন গণেশ এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, জানিস, বিনয় বোস কলকাতায় পালিয়ে গেছে।

—পালিয়ে গেছে! নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস হল না। তুই কি করে জানলি?

—মেজদা বলেছে। গণেশ নির্বিকার।

বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল রঞ্জিত।

গণেশের প্রতিটি কথায় ফুট কাটা তার চিরদিনের অভ্যাস। বিশেষ করে মেজদার প্রসঙ্গ উঠলে তো আর কথাই নেই।

আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু সে আর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল না। বরং অধীর আগ্রহে বলল, দু'চোখ ছুঁয়ে বল। মা ঢাকেশ্বরীর দিব্যি ? বল, যা বলেছিস সত্যি ?

—সত্যি কিনা তা দুদিন বাদেই জানতে পারবি। নিজের কৃতিত্বে এবার গম্ভীর হয়ে গেল গণেশ।

—কিন্তু গেল কি করে? অধীর আগ্রহে বললাম, সবদিকেই তো পুলিশ রয়েছে।

মল্লিকা, উত্তরে সেদিন মাত্র তেরো বছরের ছেলে গণেশ যা বলেছিল, পরবর্তীকালে অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছি যে, তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এ সব খবর সে কোথা থেকে, কার কাছ থেকে পেয়েছিল, সে-কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

—আমি আগেই জানতাম। সব শুনে বলল রঞ্জিত, বিনয় বোসকে ধরা পুলিশের কম্ম নয়। ওকে যে ধরবে সে এখনো তার মায়ের পেটে।

এ শুধু রঞ্জিত বা গণেশের কথা নয়, সেদিন ঢাকার প্রতিটি লোকের মনোভাবই ছিল তাই।

এ বিষয়ে কোন কথা উঠলেই তারা সগর্বে বলত, কাকে ধরবে পুলিশ? বিনয় বোসকে? এ জন্মে নয়। জ্যান্ত বিনয় বোসকে তারা জন্মেও ধরতে পারবে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন, সিংহের বাচ্চা ঠিক ওদের কলা দেখিয়ে পালাবে।

ঠিক তাই। কলা দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। সিপাহী-শান্ত্রীও কম ছিল না তবু সে অল্পের জন্য ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল বেলেঘাটা আস্তানায়।

রাত তখন অনেক। চারিদিকে নিঃশব্দ নিশ্চুপ। হঠাৎ কিসের একটা অদৃশ্য প্রেরণায় সেখানে এসে হাজির হলেন পার্টির একজন দায়িত্বশীল নেতা। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়! এক্ষুনি এ জায়গাটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

সঙ্গীরা অবাক। কি ব্যাপার! এ জায়গাটা বরাবরই কোলাহল-বর্জিত। পুলিশের কোনরকম আনাগোনাও নেই। তাহলে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন?

—উঁহু, আমার মন বলছে, আজই এখানে একটা কিছু ঘটবে। সুতরাং আর দেরি নয়! রেডি। কুইক।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সঙ্গীর দল। অধুনা রাজপুত্তুরের নিরপত্তার দায়িত্বভার তাঁদের উপরই ন্যস্ত। তার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত।

তবু সাবধানের মার নেই! সামনে কঠিন, কঠোর, রক্ত-ঝরা দিনের সঙ্কেত। রাজপুত্তুরকেই নিতে হবে সেই মহাযজ্ঞের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব। সুতরাং এ সময়ে সাবধানতার প্রয়োজন।

আশ্চর্য, আশঙ্কা মিথ্যে হল না। মাত্র আধঘণ্টা পরেই বিরাট পুলিশ-বাহিনী এসে ঘিরে ফেলল গোটা বাড়িটাকে।

কিন্তু কোথায় কে? ঘর শূন্য। তার আগেই পাখি শিকল কেটে পালিয়ে গেছে।

মল্লিকা, সেই শূন্য ঘরে সর্বাগ্রে কে এসে প্রবেশ করলেন জান? স্বয়ং চার্লস টেগার্ট।

সত্যিই অদ্ভুত লোক এই চার্লস টেগার্ট। শত্রু হলেও বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য তাঁকে প্রশংসা না করে উপায় নেই।

ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন ধূর্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় নি।

বিশেষ করে পুলিশকমিশনার হিসেবে কলকাতায় গুণ্ডার বংশকে তিনি যে ভাবে নির্বংশ করে ছেড়েছিলেন, শতমুখে তার প্রশংসা করতে হয়।

অধুনা ভাবনা তাঁর গুণ্ডাদের নিয়ে নয়, ভাবনা বাংলাদেশের এই মৃত্যুপাগল ছেলেগুলোকে নিয়ে।

ওরা এক যায়, আর আসে।

যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

ব্রিটিশ রাজত্বকে ভাবনামুক্ত করতে হলে ওদের নির্মমভাবে দমন করা ছাড়া উপায় নেই।

দলের নাম—বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। সংক্ষেপে বি. ভি.।

সর্বাধিনায়ক—পরম শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। দিব্বি ভালমানুষটি। মুখে ধর্ম ও তত্বকথা ছাড়া আর কোন কথাই নেই।

তার উপর অহিংস নীতিতে আস্থাবান খাঁটি কংগ্রেসকর্মী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকও বটে।

এহেন বিশুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীকে দেখে কে বলবে যে, তিনিই আসলে বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভির. সর্বাধিনায়ক।

অবশ্য পুলিশের সন্দেহ বরাবরই ছিল। উঁহু, লোকটিকে বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে যেন ঠিক তা নয়। কোথায় যেন অন্য একটি মানুষ লুকিয়ে আছে ওর ঐ মুখোশের আড়ালে, যাকে ঠিক বোঝা যায় না।

সত্যিই তাই মল্লিকা। তাই শেষ পর্যন্ত বক্সা, দেউলী ক্যাম্প ইত্যাদি বন্দীনিবাস গুলিতে দীর্ঘদিন আটক করে রাখলেও এ ব্যাপারে পুলিশ তাকে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে পারেনি কোনদিনও।

সেদিন যাঁরা বি. ভি-র কার্যকরী সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের অন্যতম হলেন দলের ছোটবড় সবার প্রিয় মেজদা,—হরিদাস দত্ত।

বিচিত্র মানুষ। গেরুয়াপরে, গলায় কণ্ঠি ধারণ করে তিনি তখন খাঁটি 'গোবিন্দদাস বাবাজী।' শিষ্য-শিষ্যাও জুটেগেছে বিস্তর। বাবাজীর মুখে নাম-গান শুনতে না পেলে কিছুতেই যেন মন ভরেনা তাদের।

কিন্তু আসলে বাবাজীটি যে কি চীজ তা পুলিশ জানতে পেরেছিল অনেক পরে। তারপর যা হবার ঠিক তাই। অর্থাৎ,—বিনা বিচারে আটক।

কার্যকরী সংসদে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন,—শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সী, মেজর সত্যগুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, প্রফুল্ল দত্ত, মনীন্দ্র রায় ও রসময় শূর।

একশন স্কোয়াড পরিচালনা করতেন হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত, সুপতি রায় আর নিকুঞ্জ সেন।

শুরু হল মন্ত্রণাসভা। কি করা যায় এখন বিনয়কে নিয়ে। সর্বাগ্রে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে এতটুকুও ত্রুটি থাকলে চলবে না।

একই প্রশ্ন তখন বাংলা, তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মনে। কি করা যায় এখন বিনয়কে নিয়ে।

প্রাণ তুচ্ছ। দেশের মুক্তির জন্য এমন প্রাণ অনেকেই দিতে পারে।

অতীতেও তার অভাব হয়নি। ভবিষ্যতেও তার অভাব হবেনা আশাকরি।

কিন্তু বিনয়ের কথা আলাদা। বিনয় বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। বিনয় অসম্ভবের নায়ক। বিনয় যৌবনের অগ্রদূত।

স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদিতে হলে ওর মত ইস্পাতে তৈরী ছেলেরই যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

না না, ওকে হারালে চলবে না। যে করে হোক, হিংস্র শ্বাপদের মুখ থেকে ওকে বাঁচাতেই হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিমত জানালেন, বিনয়কে অবিলম্বে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হোক। চিরকাল পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একদিন না একদিন ধরা তাকে পড়তেই হবে। তার চাইতে আপাততঃ সে নাগালের বাইরে চলে যাক।

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বোস। হ্যাঁ, সেই ভাল। বিদেশেই সে চলে যাক। অবশ্য বিদেশে যেতে হলে অনেক টাকার ব্যাপার। তা সেজন্য ভাবতে হবে না। যে করে হোক টাকার ব্যবস্থা হবেই।

—'কেন, আমরা কি মরি গেছি নাকি। স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় খেঁকিয়ে উঠলেন আচার্য স্যার পি. সি. রায়, টাকার দরকার হলে চাতি পারনি? বল্‌তি পারনি? কত টাকা চাই বল? পাঁচশো টাকা হলে চলবে?'

একই বক্তব্য পেশ করলেন লেডি অবলা বসু। টাকার জন্য ভাববেন না। আমি এখুনি দুশো টাকা দিচ্ছি। যে করে হোক বিনয়কে বাঁচাইতে হবে। ও যে আমাদের বড় গর্বের ধন।

অসাধ্য সাধন করতে হরিদাসবাবুর জুড়ি ছিল না। শুধু রডা কোম্পানির অস্ত্রলুণ্ঠনই নয়, পরবর্তী কালেও তিনি তার প্রমাণ দিয়েছিলেন বার বার।

এবারও তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত করে ফেললেন মিঃ মিল নায়ক কিংস জর্জ ডকের এক পদস্থ কর্মচারীকে। ঠিক হল কালই ভোর পাঁচটায় তিনি রাজপুত্তুরকে তুলে দেবেন সমুদ্রগামী এক জাহাজে। এখান থেকে সোজা ইটালী। তারপর—ব্যস।

সব বৃথা। বেঁকে বসলেন রাজপুত্তুর নিজেই। কারণ! কারণ বি. ভি-র পরবর্তী অভিযান।

প্রথম অভিযান শেষ। এবার দ্বিতীয় অভিযান।

সে এক ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। যেমন অকল্পনীয়, তেমনিই অভাবনীয়। এমন ভয়ঙ্কর কথা বোধহয় সেদিন কেউ চিন্তাও করতে পারত না।

কাকে পাঠানো যায় এ কাজের জন্য ? ওখানে যাওয়া মানেই তো অবধারিত মৃত্যু। জেনে শুনে কে যাবে নিজেকে এমনি করে বিলিয়ে দিতে ?

বিনয় চিরদিনই স্বল্পভাষী। এবারও মাত্র দুটি কথার মধ্য দিয়েই তিনি তার অভিমত জানালেন, 'আমি যাব।'

সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। গুড্ সিলেকসন। এর চাইতে ভাল প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না। তাছাড়া বিনয় যখন নিজে থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন তার উপর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক হল,—অভিযানের অধিনায়কত্ব করবেন রাজপুত্তুর স্বয়ং। সংগে থাকবেন আরো দুজন দুর্ধর্ষ তরুণ। দীনেশ আর বাদল। নিকুঞ্জ সেনের নিজের হাতে গড়া ছাত্র—বাদল।

—তারপর কি হল কাকামণি ?

—তারপর! তারপর সিংহটা বনের সব ছোট ছোট প্রাণীকে ধরে ধরে খেতে লাগল।

—ওরা মানা করলে না ?

—মানা করলে সিংহ শুনবে কেন ? তার গায়ে খুব জোর যে।

—আমি ঐ সিংহটাকে মারব।

—মারবে। কি করে মারবে?

—কেন, বন্দুক দিয়ে। শিশুটি এবার তার ছোট্ট এয়ার-গানটি হাতে তুলে নিল।

শাবাশ! শাবাশ! হা হা করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন রাজপুত্তুর,—এই তো চাই। জিতা রহো।

পলাতক জীবনে একদিন যে রাজপুত্তুর হাঁপিয়ে উঠেছিল, আজ আর তাকে চেনাও যায় না। অতীতের সেই রাজপুত্তুর যেন আজ কোন মায়া-কাঠির স্পর্শে একেবারেই বদলে গেছে।

চারিদিকে আজ তার স্বার্থকতার স্পর্শ। হঠাৎ যেন তার জীবনে এসে দোলা দিয়েছে এক ঝলক বসন্তের হাওয়া, আর তারই স্পর্শে সে যেন দেখতে দেখতেই রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে ভরে উঠেছে কাণায় কাণায়।

ওয়ালিউল্লা লেন থেকে কাতরাসগড় হয়ে বেলেঘাটা। বেলেঘাটা থেকে শেষপর্যন্ত দলের একনিষ্ঠ কর্মী মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহের বাড়িতে। শিশু দুটি তাঁরই।

বেলেঘাটার ঘটনার পর ঠিক হয়েছে যে ভবিষ্যতে আর কোন ঘাঁটি বা আস্তানাতে নয়, প্রতিবেশীদের সন্দেহমুক্ত হবার জন্য রাজপুত্তুরকে এখন থেকে থাকতে হবে কোন গৃহস্থ-পরিবারের অন্দর-মহলে। যেন ঘরেরই একজন আর কি।

হাসিমুখেই সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন রাজেনবাবু।

কেন নেবেন না! বিনয়ের মত ছেলে দেশে ক'টা আছে? সে তার আশ্রয়ে থাকবে, এ তো সুখের কথা।

খুশি রাজপুত্রও। ঘরের ছেলে এতদিনে ঘর পেয়ে যেন বেঁচে গেছে।

সব চাইতে ভাল লাগে ঐ কচি কচি শিশুগুলোকে। দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছে করে।

ওরাও খুশি। খেলার সঙ্গীরূপে কাকামণিকে পেয়ে ওরা যেন নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছে।

সর্বক্ষণ শুধু কাকামণি আর কাকামণি। একদণ্ড চোখের আড়াল হলেই অস্থির।

সর্বোপরি বৌদি! বৌদি তো নয়, ঠিক যেন মা। সংসারে একমাত্র মা ছাড়া আর কারো কাছেই বুঝি এমন নিঃস্বার্থ, অনাবিল স্নেহ পাওয়া সম্ভব নয়।

'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান
চোখে আসে জল ভরে।'

বৌদিকে দেখে অজ্ঞাতেই বুঝি এক সময় নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় রাজপুত্তুরের।

মা, মাগো! জানি, আমার কথা ভেবে ভেবে আজ তুমি রাতের প্রহরগুলোকে ভারী করে তুলেছ। কিন্তু তুমিই বলে দাও মা,—এখন আমি কি করব! সন্তান হয়ে মায়ের অপমান কি করে সহ্য করব?

তোমার মত ভারতবর্ষও আমার মা। কিন্তু সে যে পরাধীন। তাঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখে কি করে আমি চুপ করে থাকব বল?

আমাকে ক্ষমা কর মা। মায়ের অমর্যাদা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুঃখ কর না মা। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি।

এখানে যাঁকে পেয়েছি, তোমার মত তিনিও আমার মা। মায়েরা সবাই এক। সবাই সমান। তাহলে দুঃখ কিসের।

'ক্ষমা, আমি তোকে করেছি বিন্নু।'

নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা ক্ষণে ক্ষণে হাহাকার করে ওঠে রাজ-পুত্তুরের মা ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর। জামসেদপুরে বসে ছেলের সব কথাই তিনি শুনেছেন। কিছুই আর জানতে বাকী নেই।

শুধু ভাবনা আর ভাবনা। ভাবনায় স্রোত মনের মধ্যে অবরুদ্ধ নির্ঝরের মত পাক খেয়ে ফিরে, বেরোবার পথ পায় না।

আশ্চর্য, এটা কি ক'রে সম্ভব হল! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

এই তো সেদিন গরমের ছুটিতে বিন্নু এখানে এসেছিল। বরাবরই আসে। এবারও আসতে ভুল করেনি। বাবা-মা, ভাই-বোনদের ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে মোটেই সে অভ্যস্ত ছিল না।

মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর এল ঢাকা থেকে। শুনে ছেলে যেন একেবারে অস্থির। এখনি যেতে হবে ঢাকাতে। না গেলেই নাকি নয়।

অনেক বলে কয়েও বেশীদিন আর তাকে ধরে রাখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সে ফিরে গেল যথাস্থানে। আজও সে দিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। তারিখটা ছিল ১০ই জুলাই!

যাবার আগে একটি কথাই সে বলেছিল বার বার—'আর একবছর বাদেই আমি ডাক্তার হবো মা। তখন কিন্তু বাবাকে আমি কিছুতেই চাকরী করতে দেবো না। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তখন আমার। তাছাড়া একটা গাড়ী কিনবো, বুঝলে মা। আমরা সবাই মিলে ওটা ব্যবহার করবো।'

শুনে অনেন্দে, গর্বে চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। এই তো উপযুক্ত ছেলের মত কথা। আর মাত্র একটা বছর। তারপর বিন্নু ডাক্তারী শুরু করলে আর ভাবনা কি!

কথাটা শুনে ওঁর বাবাও কিন্তু সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন মনে

মনে। হওয়াই তো স্বাভাবিক। ছেলের মুখে এমন কথা শুনলে কোন্ বাবা মায়ের না আনন্দ হয়!

মাস দেড়েক বাদেই ভয়ঙ্কর খবর এল ঢাকা থেকে। বিনু নাকি পুলিশের বড়কর্তা লোম্যান আর পুলিশসুপার হড্‌সনকে গুলি করেছে। লোম্যান মারা গেছেন। হড্‌সনের অবস্থাও গুরুতর। বিনু নিখোঁজ। পুলিশ হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনো তার কোন সন্ধান মেলেনি।

শুনে একটা আতঙ্কে সেদিন সমস্ত অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল তাঁর। এ যে অবিশ্বাস্য। ছেলে হিসাবে বিনুর তুলনা মেলে না। এমন নম্র, বিনয়ী ও ভদ্রছেলে সত্যিই বড় একটা দেখা যায় না। ভুলেও কোন দিন সে কারো দিকে মুখ তুলে কথা বলে নি। তার পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হল!

পরে অবশ্য সমস্ত সংশয়ই কেটে গিয়েছিল তাঁর। স্বভাবের দিক থেকে বিনয়ী হলেও অন্যায়ের সংগে আপোষ করতে কোনদিনই সে অভ্যস্ত নয়। সে শিক্ষাও সে পায় নি।

ঢাকার ঐ দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত হড্‌সনই যে একমাত্র দায়ী একথা আজ কে না জানে! আর বাংলা দেশের ঐ অশান্ত ছেলে-মেয়েদের প্রতি পুলিশের বড়কর্তা লোম্যান সাহেবের নির্মম অত্যাচার কে না দেখেছে! কে না শুনেছে!

প্রতিনিয়ত এই অন্যায় আর অবিচার দেখে দেখে বিনুর মত আদর্শবান ছেলে যে একদিন না একদিন রুখে দাঁড়াবে তাতে আর বিচিত্র কি! না, সেদিক থেকে বিনু কোন অন্যায় করেনি।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় এমনি করেই।

শুধু ভাবনা আর ভাবনা। ভাববার যেন আর অন্ত নেই ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর।

বিনু আজ কোথায়, কি ভাবে আছে কে জানে! অদৃষ্টে তার কি অপেক্ষা করে আছে, তাই বা কে বলতে পারে! পলাতক-জীবন বড় কঠিন, কঠোর। এজীবনে পদে পদে সংগ্রাম। জীবন আর মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। পারবে কি সে সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে।

তবে যেখানেই থাকুক না কেন, বিনুর ঐ সুন্দর নিষ্পাপ মুখখানির দিকে তাকালে কেউ তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না, এ কথা সুনিশ্চিত। কেউ পারে নি, পারবেও না কেউ কোন দিন।

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা। রাজপুত্তুরকে যে একবার চোখে দেখেছে, কিছুতেই সে পারে নি তাকে ভালো না বেসে থাকতে। পারেন নি বৌদিও। বিনয় শুধু তার ভাই নয়, ছেলেও বটে। স্নেহ-মমতা দিয়ে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখলেও আশা যেন আর মিটতেই চায় না তার।

—ঠাকুরপো। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলেন বৌদি!

কে! বৌদি! তন্ময়তা ভেঙে নিমেষেই সহজ হয়ে উঠলেন রাজপুত্তুর।

—কি ভাবছিলে ঠাকুরপো!

—কই, কিছু না তো! সহজভাবে জবাব দিলেন রাজপুত্তুর।

—কিছু না! হেসে বললেন বৌদি, বেশ, তাহ'লে চট্ করে এই মিষ্টি দুটো খেয়ে নাও দেখি।

—এই দেখ! বিপন্ন বোধ করলেন রাজপুত্তুর, এই তো একটু আগে খেলাম।

—ফের তর্ক। শীগ্গীর খেয়ে নাও বলছি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্লেটটা তুলে নিলেন রাজপুত্তুর। উপায় কি! বৌদির হাত থেকে যে কোনমতেই রেহাই পাওয়া যাবে না, একথা সে ভাল করেই জানে।

—কি ভাবছিলে বললে না তো!

—না, তেমন কিছু নয়! রাজপুত্তুরের সারামুখে সহজ সরল হাসি।

—কিছু নয়? নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলেন বৌদি। মৃত্যুপাগল এই ভাইটির পরিচয় তিনি ভাল করেই জানেন। বুকে যাঁর অদম্য সাহস, দেহের প্রতি রক্তকণায় যাঁর শেকল-ভাঙার স্বপ্ন, তাকে আজ হোক, কাল হোক ছেড়ে যে দিতেই হবে একদিন।

খালি প্লেট নিয়ে বৌদি চলে যাবার পরে আবার কোন্ অথৈ ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন রাজপুত্তুর। আধবোজা দুটি শিথিল চোখের তারায় তার ফুটে উঠল স্বপ্নের পর স্বপ্ন। অজস্র স্বপ্ন। এক মুক্তিকামী তরুণের শেকল-ভাঙার স্বপ্ন।

'একটা বড় রকমের আঘাত হেনে এদেশের মাটিতেই আমি মরতে চাই।

ছকবাঁধা কাজ আমার পছন্দ নয়। আমি শান্ত প্রকৃতির বুকে গতির ঢেউ তুলতে চাই।

তরঙ্গ চাই। বেগ চাই। চাই একটা নতুন চেতনা। নতুন সৃষ্টি। কবে আসবে সেই শুভলগ্ন? কবে?'

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রির অন্ধকার এক সময়ে হারিয়ে যায় আলোর সমারোহে।

অবশেষে এক অপূর্ব প্রত্যূষ এসে দেখা দিল রাজপুত্তুরের জীবনে।

দলীয় সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে আনন্দে কাণায় কাণায় ভরে উঠলেন রাজপুত্তুর,—পেয়েছি। পেয়েছি। পেয়েছি মুক্তির সন্ধান।

—কি হয়েছে ঠাকুরপো? ঘরে ঢুকলেন বৌদি, হঠাৎ এমন খুশি যে।

—দারুণ খবর বৌদি। মৃদু হেসে বললেন রাজপুত্তুর, শুনলে তুমিও খুশি হবে।

—তাই নাকি! তা বলই না খবরটা।

—খবর পেলাম, কোথাকার কোন্ ভিনদেশী রাজকন্যে নাকি আমার জন্য অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছে।

সত্যি! খুশীতে ঝিলিমিলিয়ে উঠলেন বৌদি, তা' কে সেই ভাগ্যবতী বল, আমি আজই সেখানে ঘটক পাঠাচ্ছি।

—উঁহু, হল না। সকৌতুকে জবাব দিলেন রাজপুত্তুর,—তুমি তো তোমার এই ভাইটিকে জানো বৌদি। সুতরাং ঘটকের পরিবর্তে যাব আমি নিজেই।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে, একেবারে হা-রে-রে-রে শব্দ তুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

কোন বাধাই মানব না। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করলেই তাকে তরবারীর ঘায়ে শেষ করে দেব।

তারপর সেই বিরহিণী রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে একেবারে সোজা ছুট্।

—তাই বুঝি! কেমন একটা সন্দেহের ঘন রেখা ঘনিয়ে এল বৌদির চোখের তারায়, তা' কবে যাবে রাজকন্যাকে ঘোড়ায় করে আনতে?

কবে? রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিলেন রাজপুত্তুর,—সেতো দেখতেই পাবে। যাবার আগে তোমাকে ঠিক জানিয়ে যাবো।

দপ্ করে নিভে গেলেন বৌদি। রাজপুত্তুরের কথার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু বুঝে নিতে এতটুকুও দেরি হলনা তাঁর।

অবশ্য আশঙ্কা তাঁর বরাবরই ছিল, কিন্তু সে দিনটি যে এত শীগ্গীর ঘনিয়ে আসবে, তা বুঝি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তিনি।

—তুমি একাই যাবে? অদ্ভুত নিষ্প্রাণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বৌদি।

—না বৌদি। কেমন যেন অপরিচিত শোনাল রাজপুত্তুরের গলাটা।

পাছে কষ্টে-টানা ছদ্ম আবরণটা মুখ থেকে খসে পড়ে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বৌদি।

কি লাভ নিজেকে প্রকাশ করে। ওরা শুধু কাঁদাতেই জানে। তবু কেন এই ঘরছাড়া হতভাগ্যগুলোর জন্যে অবাধ্য চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে বার বার? কেন?

মল্লিকা, রাজপুত্তুরের কথার অন্তর্নিহিত অর্থটাকে যদি সেদিন চার্লস টেগার্ট অনুমান করতে পারত, তবে সে তো তুচ্ছ, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই বুঝি আতঙ্কে কেঁপে উঠত।

সে এক ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত।

যেমন অভাবনীয়, তেমনি অকল্পনীয়। একমাত্র বিনয় বোসের পক্ষেই বুঝি এই দুঃসাহসিক অভিযানের অধিনায়কত্ব করা সম্ভব।

রাইটার্স বিল্ডিং।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সবচাইতে শক্ত ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং। সেই শক্ত ঘাঁটির উপর এবার আঘাত হানতে হবে।

অঘাতে আঘাতে গুড়িয়ে ফেলতে হবে। ব্রিটিশের দম্ভকে একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিকল্পনা প্রস্তুত। দলের অন্যতম কর্মনেতা প্রফুল্ল দত্তর সাহায্যে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোথায়, কোন তলার কোন বিভাগ, তার জন্য খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুর ম্যাপও তৈরি হয়ে গেছে।

দিন-তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। এখন তার জন্য শুধু অপেক্ষা মাত্র।

না, কেউ বাদ যাবে না। কাউকে ক্ষমা করা হবে না। পররাজ্য-গ্রাসের শাস্তি হিসেবে শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিভাগকে সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শোন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল, তোমাদের ভাষায় আমরা আজ 'সন্ত্রাসবাদী'। অর্থাৎ ঘৃণ্য দস্যু তস্কর মাত্র। শান্ত সুস্থ সমাজের বুকে ত্রাসের সৃষ্টি করাই আমাদের একমাত্র কাজ।

কিন্তু প্রশ্ন করি যে,—গত যুদ্ধে জার্মানীর কাছে পরাজয় ঘটলে তোমরা কি করতে ?

তোমাদের দেশের মুক্তিকামী ছেলেদেরও কি তোমরা তখন এমনি আখ্যাই দিতে ?

শোন চার্লস টেগার্ট! স্বীকার করি, তুমি দক্ষ পুলিশ অফিসার। স্বীকার করি, তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু নিজের পানে একবার তাকিয়ে দেখ। বিচার কর নিজেকে।

তুমি চাইছ, তোমাদের ব্রিটিশজাতির স্বভাব-সুলভ পররাজ্য-লিপ্সাকে চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম করতে।

আর, আমরা চাইছি তোমাদের হাত থেকে আমাদের পরাধীন মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে। তার জন্য আমরা যে কোন মূল্য দিতে রাজী।

তাই এবার আমি চরম আঘাত হানব টেগার্ট।

না, দূর থেকে আক্রমণ নয়, সম্মুখ সংগ্রাম। মুখোমুখি এবার তোমার সঙ্গে আমরা পাঞ্জা লড়ব টেগার্ট।

জানি, তুমি বাধা দেবে। বেশ, তাই দিয়ো।

তোমার রয়েছে বিরাট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী।

আর আমার! আমার সঙ্গে থাকবে দুটি মাত্র সংগী। দীনেশ আর বাদল।

বিক্রমপুরের বিদগাঁও-এর অবনী গুপ্তের ছেলে বাদল, আর যশোলঙ্গ-এর সতীশ গুপ্তের ছেলে দীনেশকে তোমার পুলিশ এত শিগগীর ভুলে যায়নি আশাকরি? ওরা যে তাদের অনেক রাতের ঘুমই কেড়ে নিয়েছিল।

সেদিন ওরাই থাকবে আমার সঙ্গে।

বন্দী করবে? আমাকে! বিনয় বোসকে!

না, তেমন সৌভাগ্য তোমার কোন দিনই হবে না টেগার্ট। তুমি কেন, ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালেও বিনয় বোসের নাগাল তারা এ-জন্মে কোনদিনই পাবে না। কারণ আমাদের পার্টির অসামান্য সংগঠন সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

হয়তো আমার দেহটা পাবে, কিন্তু আমাকে নয়! সুতরাং সে চেষ্টা না করে সেদিন তাকিয়ে দেখো যে, শেষ পর্যন্ত লড়াই করে

বিনয় বোস ও তাঁর বন্ধুরা কেমন হাসতে হাসতে কত অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে।

জেল-ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল কুখ্যাত কর্ণেল সিম্পসন, তুমিও শোন—

সর্বপ্রথম আঘাত হানব আমরা তোমাকেই। তোমার স্পর্ধা এত গগণস্পর্শী হয়ে উঠেছে যে, আলীপুর জেলে আবদ্ধ, আমাদের মহান নেতা সুভাষচন্দ্রকে তুমি কতগুলো তৃতীয় শ্রেণীর পাঠান কয়েদী দ্বারা প্রহার করাতে পর্যন্ত কুন্ঠিত হওনি।

এর উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। না, তোমার ক্ষমা নেই।

খ্যাত-অখ্যাত ইংরেজ কর্মচারীর দল, তোমরাও শোন—

ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কারো সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের কোনরকম আঘাত করার বাসনাও আমার নেই।

তবে আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায়।

বিপ্লবীর গুলি যে কখনো মিস্ হয় না, তার প্রমাণ তো তোমরা ঢাকাতে লোম্যান ও হড্‌সনের ক্ষেত্রেই পেয়েছ।

'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

মল্লিকা, ঠিক তখনই কলকাতার বুকে দেখা গেল বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা এই পোষ্টারগুলো। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু পোষ্টার। যেন লালে লাল হয়ে গেছে মহানগরী।

শহরবাসী অবাক। কি ব্যাপার! কার রক্তে এমন করে সর্বনাশের নেশা লাগল! মনে হয় কিছু যেন একটা ঘটবে।

হ্যাঁ, কিছু একটা ঘটবে। চার্লস টেগার্টের ধারণাও তাই। নিশ্চয়ই ঘটবে।

রক্তের মত লাল অক্ষরে লেখা পোস্টারের ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো যেন তারই অশুভ সঙ্কেত।

তবে চার্লস টেগার্টও প্রস্তুত। লালবাজারে তাঁর বিরাট পুলিশ-বাহিনী তৈরী হয়ে আছে। শুধু আদেশের অপেক্ষামাত্র।

দীনেশ গুপ্ত।

বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ গ্রামের সতীশ গুপ্তের ছেলে দীনেশ গুপ্ত। বৈপ্লবিক সংস্থা বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সের (বি. ভি) দুরন্ত দুঃসাহসী সৈনিক দীনেশ গুপ্ত। কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বিশ বছরের দীনেশ গুপ্ত একাই যেন অগ্নিযুগের গোটা একটা ইতিহাস।

জন্ম হয়েছিল ১৯১১ সনের ৬ই ডিসেম্বর। কর্মস্থল ঢাকাতে। মাঝখানে সংগঠনের কাজে কিছুদিন মেদিনীপুর। তারপর আবার ঢাকাতে। সবশেষে রাইটার্স বিল্ডিংসের অভ্যন্তরে সেই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে।

অফুরন্ত প্রাণসম্পদে ভরপুর দুরন্ত বেপরোয়া যুবক। চোখে দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। পেশীবহুল স্বাস্থ্য আর প্রাণপ্রাচুর্যে যেন উপচে পড়ছে তার জীবনপাত্র।

সারাদেশব্যাপী তখন শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন। কেউ বিলিতি দ্রব্য ব্যবহার করব না। কিনবও না। কেনা মানেই তো সহযোগিতা করা। সুতরাং কেউ তা করব না। কোন মতেই না।

ঢাকাতেও জোর পিকেটিং চলছে। বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে জড় হয়েছে সেদিন বিখ্যাত বিলিতি মদের দোকান 'রায় কোম্পানী'র সামনে। 'কেউ বিলিতি মদ কিনবেন না ভাই। আমাদের কথা রাখুন।'

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটে এলেন কুখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ হড্সন। বড্ড বাড় বেড়েছে এই পিকেটার-গুলো। দেখাচ্ছি মজাটা।

পিকেটাররা নির্বিকার। আসুক না পুলিশ। আমাদের কাজ আমরা করবই। কেউ বিলিতি জিনিস কিনবেন না ভাই। হাতজোড় করে অনুরোধ করছি। দেশের অর্থ দেশে রাখুন।

তবে রে! খপ্‌ করে একটি ছেলের হাত চেপে ধরলেন মিঃ হড্‌সন। তারপরই হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরলেন হিংস্র বাঘের মত।

'স্টপ্‌! হ্বাট্‌স নান অফ্‌ ইওর বিজনেস্‌ টু বীট্‌ হিম।'

সাইকেলে যেতে যেতে সহসা এদৃশ্য দেখে নেমে পড়লেন দীনেশ। তারপরই ফুঁসে উঠলেন বজ্রকঠোর স্বরে।

হোয়াট্‌! ঘুরে দাঁড়ালেন হড্‌সন। দুচোখে তার অসহ্য জ্বালা। কার এত বড় সাহস যে তার মুখের উপর কথা বলে?

দৃঢ়তার সঙ্গে দীনেশ নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—'স্টপ্‌। ইয়েস্‌, ইউ হ্যাভ্‌ নো রাইট টু বীট হিম'···

রাগে, অপমানে লালমুখ আরো লাল হয়ে উঠল হড্‌সনের। সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে তিনি সগর্জনে বললেন —'গেট্‌ অ্যাওয়ে—অর, আই শুট ইউ ডাউন।'···

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন দীনেশ—'শুট মী হিয়ার,—ইফ ইউ আর নট এ কাওয়ার্ড।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন হড্‌সন। বলে কি! এ যে দেখছি একেবারে আসল কেউটের বাচ্চা। বেশ বোঝা যায় যে এ ছেলে ভাঙবে তবু মচকাবে না। কি লাভ বাপু ঝামেলা করে। তার চাইতে মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

শুধু একবার নয়, দীনেশের দুঃসাহসের এমনি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অসংখ্য বার।

যেমন পাওয়া গিয়েছিল বিক্রমপুরের একটা বাজারে। তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছিল যথেষ্টই। তবে দীনেশকে নয়, দিতে হয়েছিল অপর পক্ষকে।

ঢাকা জেলার 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বাহিনীর অফিসার-কমাণ্ডিং জ্যোতিষ জোয়ারদারের নেতৃত্বে দীনেশ সেদিন গাঁয়ের পথ দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে চলেছেন গুটি কয়েক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে।

বি. ভি-র. সদস্যদের কাছে এটা ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। নিজেকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে নেবার জন্য সবাইকেই সেদিন এমনি মার্চ করে যেতে হত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বিশেষ করে নতুন সদস্যদের।

বিপদ হল একটা বাজারের কাছাকাছি গিয়ে। সহসা রব উঠল —ডাকাত! ডাকাত!

আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেল ঝপ্‌ঝপ্‌ করে।

ডাকাত! ডাকাত! স্বদেশী ডাকাত। খাকি পোশাক পরা এই ছেলেগুলো স্বদেশী ডাকাত না হয়েই যায় না।

বিপদের উপর বিপদ। পাশেই থানা। চিৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু ছুটে এলেন তার সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে।

আমার এলাকায় ডাকাত! চালাকী পায়া হ্যায়! চৌদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব না আজ!

দীনেশ অবাক। এ কি! চার পাশে তাদের এত সেপাই-শান্ত্রী কেন! ওদের হাতের রাইফেলগুলোই বা তাদের দিকে নিবদ্ধ কেন! কি ব্যাপার!

ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে নিমেষে সবাইকে আড়াল করে দাঁড়ালেন দীনেশ। তারপরই মুখর হয়ে উঠলেন দারোগাবাবুটিকে লক্ষ্য করে।

—খুব দেখালেন মশাই। ডাকাত হলে সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র থাকত। আমাদের কারো হাতে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? তাহলে ডাকাত হলাম কি করে?

তাই তো! তাই তো! এতক্ষণ বাদে যেন দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেলেন দারোগাবাবু। না, এরা ডাকাত নয়। ভুল হয়ে গেছে।

—না না, তাতে কি হয়েছে! নিমেষে আকাশের মত উদার হয়ে উঠলেন দীনেশ, ভুল কার না হয়! আমাদেরই কি হয় না! তার

জন্য আপনি দুঃখ করবেন না দাদা। বরং ভুলটা সংশোধন করে ফেলুন।

—সংশোধন করে ফেলব? দারোগাবাবু অবাক,—তার মানে?

—মানে আমাদের সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে দিন।

মিষ্টি! নিজের কানকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না দারোগাবাবু। এ কি ছেলে রে বাবা! এ যে আবার মিষ্টি খেতে চায় দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পেটভরে। দীনেশের সারামুখে শিশুর সারল্য।

দাদা বলে যখন ডেকেছি, তখন ছোটভাইদের এই আবদারটা রাখতেই হবে। নইলে বাধ্য হয়েই কোয়ার্টারে গিয়ে বৌদির কাছে হাজির হব। হাজার হোক, মায়ের জাত। ক্ষুধার্ত দেবরদের তিনি ফেলতে পারবেন না নিশ্চয়ই। অবেলায় ওসব ঝামেলা করে লাভ নেই। তার চাইতে এখানেই হয়ে যাক। কই ময়রা মশাই, মিষ্টির গামলাগুলো সব বের করুন। আহা অত ভাবছেন কেন? দাদা যখন সঙ্গে রয়েছেন, তখন দাম আপনি ঠিকই পেয়ে যাবেন। নিন, বের করুন।

বাধ্য হয়েই সম্মতি দিতে হল দারোগাবাবুকে। উপায় কি! যা নাছোড়াবান্দা ছেলে। রাজী না হলে ও কি সহজে ছাড়বে নাকি!

দীনেশ খাইয়ে ছেলে। এত অল্পতে তার খুশি হবার কথা নয়। সংগীরাও কেউ কম যান না। তাই খালি গামলাগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার একসময়ে তিনি মুখর হয়ে উঠলেন,—আর নেই ময়রা মশাই?

—আজ্ঞে না,—কাঁচুমাচু করে জবাব দিল দোকানদারটি, সব শেষ।

—সব শেষ! আহা, কি মধুর কথাই না শোনালেন! মনটাই দিলেন খারাপ করে। তা মিষ্টি না থাক, আর কিছু আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিমকি, সিঙ্গাড়া—

—ব্যস, ব্যস! একেবারে ঝুড়ি-শুদ্ধ সব নিয়ে আসুন।

দেখতে দেখতে ঝুড়ি খালি। তবু মন ওঠে না দীনেশের। আর কি খাওয়া যায়। আরে। সাদা সাদা ওগুলো কি দেখা যাচ্ছে?

—আজ্ঞে, ওগুলো ছানা। সন্দেশ বানাব বলে তুলে রেখেছি।

ব্যস, ব্যস! ওতেই চলবে। দিন, ওগুলোই দিন।

ছানাও শেষ, তবু খুঁতখুঁত ভাবটা কিছুতেই যেন যায় না দীনেশের। ঠিক যেন মুড আসছে না। মনে হয়, কি যেন একটা বাদ রয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ঘরের কোণে ঐ গামলাটার মধ্যে কি রয়েছে বলুন দেখি?

—আজ্ঞে ওগুলো ক'দিনের বাসি মিষ্টি। ভীষণ টক্ হয়ে গেছে। আপনারা দারোগাবাবুর অতিথি। জেনে-শুনে আর তো আপনাদের খারাপ জিনিস দিতে পারিনে।

—ব্যস্, ব্যস্! তার জন্য আপনি ভাববেন না। দীনেশ গুপ্ত সর্বভুক। তার কাছে ভালমন্দ সব সমান। নিয়ে আসুন ঝট্‌পট্। মিষ্টির পরে টক্‌টা মোটেই খারাপ লাগবে না।

সত্যিই খারাপ লাগল না। দেখতে দেখতে গামলা খালি। এমন কি মিষ্টির রসগুলোও বাদ গেল না। এক চুমুকেই সব সাবাড়।

—আঃ! গভীর তৃপ্তিতে মস্তবড় একটা ঢেঁকুর তুললেন দীনেশ, এতক্ষণে মনে হয় কিছুটা খেয়েছি। এবার তাহলে চলি দাদা। অনেকটা পথ যেতে হবে। বৌদিকে আমাদের নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে,—আবার এদিকে এলে সেদিন তাঁর হাতে মিষ্টি খেয়ে যাব। চলি—

আবার শুরু হল পথ-পরিক্রমা।

দীনেশ নির্বিকার। কোন ভাবনা নেই। কোন চিন্তা নেই। যেন এগিয়ে চলার সহজিয়া আনন্দেই সে বিভোর।

চুপ করে থাকা দীনেশের স্বভাব নয়। যেতে যেতে সহসা একসময়ে তিনি গুনগুনিয়ে উঠলেন নিজের মনে—

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্রছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।'

শেষ পর্যন্ত তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন দারোগাবাবু। কি অদ্ভুত প্রাণবন্ত ছেলে। কিছুতেই যেন ওকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

সত্যিই তাই। দীনেশকে এড়ানো সহজ নয়। সংসারে সবাই তার আপনজন। সবাই তার দাদা, বৌদি। সবাই তার মাসীমা, পিসিমা। এমন ছেলেকে ভাল না বেসে কি কেউ থাকতে পারে কখনো?

অথচ কাজের বেলায় অত্যন্ত সিরিয়াস। সেখানে সামান্য ত্রুটিও তার কাছে অসহ্য। এ ব্যাপারে এমন কি নিজেকেও তিনি কোনরকমে ক্ষমা করতে রাজী নন।

এমনি একদিনের কথা। রাত তখন প্রায় তিনটে। হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠলেন দীনেশ। তারপরই জামা-কাপড় পরে নিলেন চোখের নিমেষে।

এক্ষুনি একবার পল্টন মাঠে যেতে হবে। গুটি তিনেক ছেলেকে এসময়ে ওখানে আসতে বলা হয়েছে। তাদের গড়ে পিটে তৈরি করে নেয়া দরকার।

কিন্তু এ কি! সাইকেলে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন দীনেশ। একদম হাওয়া নেই চাকাতে। কখন যে বেরিয়ে গেছে খেয়ালও হয়নি।

এখন উপায়! আর মিনিট পাঁচেক মাত্র বাকী। এত অল্প সময়ের মধ্যে উয়ারীর বাসা থেকে এই মাইল দেড়েক পথ সে যাবে কি করে!

নিমেষে মনস্থির করে নিল দীনেশ। ডিউটি ইজ ডিউটি। সেখানে কোনরকম এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

শুরু হল ম্যারাথন রেস। শুরু হল প্রাণান্তকর দৌড় প্রতিযোগিতা। যেতেই হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যেতে হবে।

অবশ্য দু-চার মিনিট দেরি হলেও এমন কিছু এসে যাবে না।

ছেলেরা ঠিকই অপেক্ষা করবে। কিন্তু কেন তা হবে? নিজে খাঁটি না হলে অন্যের কাছে সে জিনিস আশা করা যায় না। সুতরাং এক সেকেণ্ডও দেরি হলে চলবে না।

না, দেরি হয়নি। প্রায় মিনিট খানেক আগেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন পল্টন মাঠের সেই নির্দিষ্ট সীমানায়।

এই ছিল দীনেশ। এমনি ছিল তার কর্মদক্ষতা।

শুধু একটি ছুটি ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বারবার। এক কথায় যাকে বলে সর্বতোমুখী প্রতিভা, তিনি ছিলেন তাই।

শিল্পী, কবি, দার্শনিক, প্রতিটি বিশেষণ ছিল তার সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাহিত্যিক হিসেবেও পিছিয়ে ছিলেন না তিনি। মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় তার লেখা গল্প ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো বলতে গেলে তার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। এমন রবীন্দ্রভক্ত সত্যই বিরল ছিল তখনকার দিনে।

তবে সবার উপরে ছিল তার অপূর্ব সংগঠন-শক্তি। পরবর্তীকালে যে মেদিনীপুর একদিন অগ্নিযুগের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল, তার মূলে ছিলেন এই দীনেশ। তিনিই ছিলেন 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে'র মেদিনীপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

হঠাৎ নির্দেশ এল,—তোমাকে মেদিনীপুর যেতে হবে দীনেশ। ওখানকার ছেলেদের সংঘবদ্ধ করা দরকার। আশা করি তুমি তা পারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করে মেদিনীপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হলেন দীনেশ। আমি পারব। পারতেই হবে আমাকে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সবকিছু পর্যুদস্ত করে আমাকে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

কাজ, কাজ আর কাজ। নতুন জীবনে, নতুন পরিবেশে দেখতে

দেখতেই কাজের নেশায় মশগুল হয়ে গেলেন দীনেশ। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেল মনের অতল গভীরে।

ফল হল আশাতীত। দেখতে দেখতে ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল কোন-মায়াকাঠির স্পর্শ পেয়ে।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে তাদের ধরে রাখা দায়। উন্মত্ত তরুণ রক্ত যেন অসহ্য আবেগে ফেটে পড়তে চায়। কাজ চাই। কাজ চাই।

হঠাৎ আবার একদিন জরুরী তলব এসে হাজির। 'অবিলম্বে ঢাকা চলে এস দীনেশ। তোমাকে বড্ড দরকার।'

উপযুক্ত সহকর্মীর হাতে মেদিনীপুরের ভার ন্যস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে অবার ঢাকাতে। আগে পার্টি, তারপর অন্য কথা। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার সেখানে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

১৯৩০ সন। বাংলার দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত।

সর্বত্র এক রব,—এগিয়ে চল। এতকাল একতরফাই আমরা মার খেয়েছি। এবার পাল্টা মার দেবার পালা। আর সময় নেই। প্রস্তুত হও।

দীনেশও সে আহ্বান শুনেছেন। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। অনেক মূল্য।

মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত। যে কোনরকম মূল্য।

তার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও তিনি করেছেন যথোপযুক্তভাবে।

প্রস্তুত করেছেন দেহ ও মন উভয় দিক থেকেই।

এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হল না।

দেখতে দেখতেই ঝড় উঠল। উদ্দাম ঝড়।

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেন। বাড়ির মালিক সুরেশ মজুমদার।

তখনকার দিনে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বি. ভি-র বেশ কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। এই দোতলা বাড়িটাই ছিল তার হেড কোয়ার্টার।

অনেকের মত বিনয়ও সেদিন এখানেই এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তাকে পাঠানো হয় এমনি আর একটি ঘাঁটি মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহের বাড়িতে।

আর একটি ঘাঁটি ছিল নিউ পার্কস্ট্রীটের একটা বাড়িতে। নীচে দলের সদস্য ডাঃ অনিমেষ রায় ও ডাঃ হিমাংশু ব্যানার্জীর চেম্বার।

দোতলায় আত্মগোপনকারী বাঘা-বাঘা সব বিপ্লবীদের আনাগোনা। অ্যাকসন স্কোয়াডের সদস্য নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায়ও তাদের মধ্যে রয়েছেন।

আর রয়েছেন দীনেশ ও বাদল। সতর্কতা হিসেবে আগে থেকেই তাদের এখানে এনে রাখা হয়েছে।

সাতই ডিসেম্বর। অভিযানের আর একদিন মাত্র বাকী।

ওদিকে প্রস্তুতিপর্ব শেষ। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বার বার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বহুমূল্য ইয়োরোপীয়ান পোশাক-পরিচ্ছদগুলো তৈরি হয়ে এসে গেছে।

ঐ পোশাকের ঠাট দেখিয়েই কাল তিনজনকে গট্ গট্ করে ঢুকে যেতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংসের অভ্যন্তরে। যেন কোন বড়দরের অফিসার আর কি! নইলে দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল নিকুঞ্জবাবুর।

নক্সাতে খুঁটি-নাটি সবকিছু দেওয়া থাকলেও বিরাট ঐ রাইটার্স বিল্ডিংসের অলি-গলি সম্বন্ধে কারো কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কাউকে একবার দেখিয়ে শুনিয়ে আনলে কেমন হয়।

বিনয় পলাতক, তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দীনেশ। দীনেশকে একবার ঘুরিয়ে আনলে ক্ষতি কি।

—আমি! শুনে দীনেশ হেসেই খুন, জানেন তো আমাকে। আমি হলাম যাকে বলে একবার খাঁটি ক্ষত্রিয়। তার চাইতে আপনি বরং বাদলকে নিয়ে যান। ও ঠাণ্ডা মাথায় সব দেখে-শুনে আসবে।

হাসতে হাসতে বাদলকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নিকুঞ্জবাবু। কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলে তো নয়, যেন বারুদের স্তূপ। কখন কি করে বসবে ঠিক কি!

সন্ধ্যার আগেই আবার তারা ফিরে এলেন যথাস্থানে। পরিচিত লোকের সাহায্যে বাদলকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। সুতরাং সবদিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' নিয়ে দীনেশ তখন ধ্যানমগ্ন। দেখে মনে হয় এ যেন এতদিনকার চেনা সেই দীনেশ নয়। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্বা। শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত, দীনেশের এই রূপটি চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

অজ্ঞাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। আজও একান্ত প্রিয় দীনেশ ও বাদল তাদের চোখের সামনে রয়েছে।

কিন্তু কাল! শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারে কাল ওদের অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করে আছে। আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

—শোন দীনেশ। তন্ময়তা ভেঙে বললেন নিকুঞ্জবাবু, তুমি তো খেতে ভালবাস। কাল যাবার আগে কি খেতে-চাও বল?

—অ্যাঁ! 'বলাকা' রেখে নিমেষে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। খাওয়াবেন! তা বলছেন যখন, তখন মাংসই হোক। তবে এক কথা। মাঝপথে হাত গুটিয়ে নিলে চলবে না। 'আর না' বলা

পর্যন্ত সমানে দিয়ে যেতে হবে। আর দই-মিষ্টি! ও আর কি বলব। ও কি আপনি না খাইয়ে ছাড়বেন। কি বলিস বাদল!

মনে মনে হাসলেন বাদল। খাইয়ে বলে দীনেশদার বরাবরই মনে মনে বেশ একটু গর্ব আছে। দেখা যাবে কাল তার সেই গর্ব কোথায় থাকে। চেনে না তো বাদল গুপ্তকে।

১৯৩০ সন। ৮ই ডিসেম্বর। অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন।

সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল নিউ পার্ক স্ট্রীটের সেই গুপ্তকেন্দ্রে। দিন আগত ঐ।

প্রথমেই শুরু হল দীনেশ ও বাদলের সেই ফিস্ট। সে এক দেখার মত জিনিস। যেমন দীনেশ তেমনি বাদল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। দুজনেই সমান। কেউ হার মানতে রাজী নয়।

—আর মাংস দেব দীনেশ? প্রশ্ন করেন নিকুঞ্জবাবু।

—তার মানে! দীনেশ অবাক, এখনো তো শুরুই করিনি।

—তোমাকে দেব বাদল?

—আপনি দিতে থাকুন, তারপর সময় হলে আমিই মানা করব।

—পারবিনে বাদল, পারবিনে। তেড়ে ওঠেন দীনেশ, আমার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কোন লাভ নেই। হেরে ভূত হয়ে যাবি।

—দেখাই যাক না। বাদল নাছোড়বান্দা।

নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন নিকুঞ্জবাবু।

স্বাধীনতার বেদীমূলে আজ ওদের চরম আত্মোৎসর্গের দিন। কেউ ফিরবে না। কেই কোনদিন আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না।

কিন্তু দেখে কে বলবে যে, তার জন্য ওদের মনে এতটুকুও দুর্ভাবনা আছে। মৃত্যু যেন ওদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

অথচ কতই বা বয়েস ওদের।

বিনয়ের বাইশ, দীনেশের কুড়ি, বাদল আঠারোয় পা দিয়েছে সবেমাত্র। ভাবতেও যেন অবাক লাগে।

খাওয়া শেষ। কিছুই পড়ে নেই। কিছুই অবশিষ্ট নেই!

সব শেষ। জামাকাপড় পরাও শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন নিকুঞ্জবাবু। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনা দরকার। তারপর সোজা খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে। বিনয়কে নিয়ে ওখানেই এসে রসময়বাবু অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়েছে।

খানিক বাদেই নিকুঞ্জবাবু ফিরে এলেন ট্যাক্সি নিয়ে। আর দেরি নয়। এবার ওদের ডেকে আনলেই হয়।

ডাকতে গিয়েও কিন্তু ডাকা হল না নিকুঞ্জবাবুর। তার আগেই সহসা কি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর গতি।

দীনেশ তখন তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে বিশেষ কয়েকটি লাইন—

> 'যে শুনেছে কানে
> তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
> সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
> নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
> শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর।

দীনেশের আবৃত্তি! শুধু আজই নয়, কত দিন, কত সন্ধ্যায়, কত নিভৃত অবকাশে দীনেশের কণ্ঠ এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে।

আজ সবকিছুর ইতি। সবকিছুর পরিসমাপ্তি। লগ্ন আসন্ন। মন না চাইলেও এবার তাকে বিদায় দিতে হবে। চিরবিদায়।

এক মুহূর্তের দ্বিধা।

তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন নিকুঞ্জবাবু,—দীনেশ!

কে! নিমেষে বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এল দীনেশ। আর দেরী নয়। সময় নিকট হয়েছে এবং বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

ঢাকাতে লোম্যান নিহত হয়েছিলেন ২৯শে আগস্ট।

ইতিমধ্যে তিন মাস পেরিয়ে গেছে।

আজ ৮ই ডিসেম্বর।

নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই বৌদির। সকাল থেকে ঠাকুরপো কি খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা বেশি পছন্দ করে,—এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

শুরু হয়েছে অবশ্য কাল থেকেই, তবে তার জের এখনো মেটেনি। কেবলি মনে হয়, কিছু বুঝি বাদ রয়ে গেল।

মাঝে মাঝে দুঃসহ বেদনায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে, আবার পরক্ষণেই প্রাণপণ শক্তিতে সামলে নেন নিজেকে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি। স্নেহবুভুক্ষু ভাইটি কাল থেকে কোনদিনই তার হাতে আর খেতে আসবে না।

সকাল সাতটা। রাজপুত্তুর তখনো ঘুমে অচেতন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবনের সুগভীর নিদ্রা।

বৌদি বার বার এসে দেখে গেছেন, তবু ইচ্ছে করেই ডাকেন নি।

কেমন মায়া হয়েছে। আহা ঘুমোক। আর কতক্ষণই বা! এর পর ডাকলেও আর সাড়া মিলবে না।

কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না। সোয়া সাতটা হয়ে গেল। সকাল ন'টার মধ্যেই যে ওকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে।

—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! অসীম মমতা ঝরে পড়ল বৌদির কণ্ঠ থেকে।

—এঁ্যা! ধড়মড় করে উঠে বসলেন রাজপুত্তুর, ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে, আমাকে ডাকোনি কেন বৌদি?

—চা-টা খেয়ে নাও ভাই। যাও, মুখটা ধুয়ে এস।

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে রাজপুত্তুর অবাক। একি! দেখ দেখি কাণ্ড! এত মিষ্টি কেউ কখনো খেতে পারে?

—লক্ষ্মী ভাইটি, খেয়ে নাও। বৌদির চোখের তারায় সকরুণ মিনতি।

—তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন আর উপায় কি! খেতে খেতে জবাব দিলেন রাজপুত্তুর, কিন্তু আর তো বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না বৌদি। ঠিক ন'টার সময় দূত এসে যাবে, তার আগেই আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। আমি বরং এই ফাঁকে স্নানটা সেরে ফেলি।

স্নান করে আসতে না আসতেই আবার খাবার তাগিদ। প্রতিবাদ করা বৃথা সুতরাং বসতেই হল।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে রাজপুত্তুর দিশেহারা। এ যে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার।

নানারকম মাছ, মাংস, তরকারী, পোলাও, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ নেই। একজন কেন, দশজনেও বুঝি এ-খাবার খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

—খাও ভাই। বৌদির দু'চোখে আসন্ন বর্ষণের ইঙ্গিত, নইলে এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না। আমি যে তোমার জন্যই এ-সব করেছি।

—দেখ দেখি কাণ্ড! হাসতে হাসতে বললেন রাজপুত্তুর, এত খাবার কখনো মানুষ খেতে পারে। তাছাড়া তুমি তো সব জানো বৌদি। শরীর ভারী হয়ে গেলে লড়ব কি করে। কব্জীর জোর দেখাতে হবে তো। ঠিক আছে, তুমি দুঃখ করো না। আমি সবটাই আস্তে আস্তে খেয়ে নিচ্ছি।

খাবার শেষ। এবার পোশাকের পালা। সাধারণ পোশাক নয়, বহুমূল্য রাজবেশ।

দামী স্যুট, দামী নেকটাই, দামী জুতো, সব কিছুই চোখ ঝলসানো ব্যাপার। মাথার হ্যাটটাও তাই। দীনেশ ও বাদলের জন্য একই ব্যবস্থা।

পোশাক হল রাইটার্স বিল্ডিং-এর পাসপোর্ট। টিপ্‌টপ্‌ পোশাক হলে প্রহরীরা ভয়েও কোন প্রশ্ন করে না। ভাবে, কোন বড়দরের হোমরা-চোমরা কেউ হবে হয় তো। এই প্রাথমিক বাধা এড়ানোর জন্যই এই বহুমূল্য পোশাকের ব্যবস্থা।

এ্যাকশন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য রসময় শূর এসে গেছেন। আর দেরি নয়। ওদিকে পাইপ রোডের মোড়ে দীনেশ ও বাদল ইতিমধ্যে এসে যাবে।

অপূর্ব সংযমের বলে এতক্ষণ নিজেকে সংযত করে রাখলেও, এবার আর কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না বৌদি। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বেদনায় সহসা তিনি ভেঙে পড়লেন ছোট্ট শিশুর মত।

—একি! ত্রস্তে নিজেকে দৃঢ় করে তোলেন রাজপুত্তুর, যে দেশের মায়েরা যুদ্ধে যাওয়ার আগে সন্তানকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন, সে দেশের মেয়ে হয়ে এ-সময়ে তোমার চোখে জল কেন বৌদি? তাছাড়া তুমিও দলের একজন সহকর্মী। তুমিও বিপ্লবী। এ দুর্বলতা তো তোমার সাজে না বৌদি।

—ঠিক কথা। সায় দিয়ে স্ত্রীর হাতে পোশাকগুলো তুলে দিলেন রাজেনবাবু, এই তো সত্যিকার মানুষের কথা। ছেলে তোমার পরাধীন দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, এ সময়ে উপযুক্ত মায়ের মতই তুমি তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দাও। নাও,

ধর। এতবড় সৌভাগ্য, এতবড় সুযোগ, জীবনে আর কোনদিনই পাবে না। শুরু কর।

আস্তে আস্তে নিজেকে দৃঢ় করলেন বৌদি।

তাই তো! এমন ছেলে ক'জনের আছে? সে কত বড়। কত মহৎ। বীরের মত আজ সে নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছে স্বাধীনতার বেদীমূলে।

এ সময়ে চোখের জল ফেলা তাঁর সত্যিই সাজে না। তার চাইতে নিজের হাতেই তিনি তাকে সাজিয়ে দেবেন মনের মত করে।

—যাই বৌদি। শেষ বিদায়ের আগে মাতৃসমা বৌদির পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিলেন রাজপুত্তুর।

—এস ভাই। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন বৌদি, কাজ শেষ হলে ফিরে এসো।

—ফিরে এসো!

হেসে উঠলেন রাজপুত্তুর। শিশুর মত অনাবিল প্রাণ-খোলা হাসি, যা চিরদিন সবাই তাঁর মুখে দেখে এসেছে। আজ শেষ বিদায়ক্ষণেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

ইঙ্গিত করতেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিল। লগ্ন আসন্ন। আর দেরি নয়।

অপলক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন বৌদি। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময়ে গাড়িটা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে নিলেন বৌদি। শোক করবার অবকাশ তাঁর কোথায়!

হয়তো এখুনি প্রতিবেশীদের চোখগুলো কৌতূহলে প্রখর হয়ে উঠবে। হয়তো প্রশ্নের পর প্রশ্নে তারা মুখর হয়ে উঠবে।

না, এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই।

বুকটা ব্যথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও এসময়ে মুখের হাসি তাঁকে জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। এ-ছাড়া কোন উপায় নেই।

মল্লিকা, সেদিন শুধু এই বৌদিটিই নয়, এমন কত বৌদি, কত মা, কত স্নেহময়ী দিদি যে বাংলাদেশের এই দামাল ছেলেগুলোকে ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবরকম বিপদ থেকে আগলে রেখেছিলেন, তার বোধহয় কোন আদি-অন্ত নেই। ঘর-ছাড়া, কুলহারা এই ছেলেগুলোর জন্য তাদের শুধু বুকই ফেটেছে, কিন্তু মুখ ফোটেনি কোনদিনও।

শুধু আড়াল থেকে নিঃশব্দ সহযোগিতা নয়, আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও সেদিন বড় একটা কম ছিল না। তার মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, কল্পনা দত্ত, লীলা রায়, পারুল মুখার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ইত্যাদি বহু বিপ্লবিণীর কাহিনী তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ।

এর বাইরেও যে এমনি কত অসংখ্য নারী তাঁদের ত্যাগ ও কর্মদক্ষতা দ্বারা কত ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, ইতিহাসও বোধ করি তার কোন সঠিক হিসাব দিতে পারবে না।

প্রতিদানে তাঁরা কি পেয়েছেন জান! পেয়েছেন শুধু অপমান আর অত্যাচার, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন, দুঃখ আর দারিদ্র্য, লজ্জা আর ঘৃণা।

এই প্রসঙ্গে দু'একজনের কাহিনী তোমাকে বলছি।

বিক্রমপুরের সুহাসিনী গাঙ্গুলী। দলের প্রয়োজনে চন্দননগরে গিয়ে শশধর আচার্যের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি কাটিয়ে দিলেন মাসের পর মাস।

পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে হলে বাইরে থেকে একটা লোকদেখানো শান্ত নিরাপদ গৃহকোণের প্রয়োজন। সুতরাং উপায় কি।

তারপর? তারপর একদিন তাঁর আশ্রয় থেকেই ধরা পড়লেন চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দগুপ্ত, জীবন ঘোষাল প্রমুখ বীর বিপ্লবীবৃন্দ।

জীবন ঘোষালকে অবশ্য জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় নি। চার্লস টেগার্টের গুলিতে সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

এবার নির্যাতনের পালা। হ্যাঁ, যে চার্লস টেগার্ট একদিন নিহত বাঘা যতীনকে একটি লোকদেখানো সেলাম ঠুকেছিলেন, তিনিই সেদিন উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষিকা সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে চড় মেরে মেরে হাতের সুখ করেছিলেন।

শুধু কি তাই! বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে সেদিন সভ্য ব্রিটিশ সরকার এই পরমশ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকাটির নামে নানাবিধ কুৎসা রটাতে পর্যন্ত কোনরকম দ্বিধাবোধ করেনি।

উজ্জ্বলা মজুমদারকেই কি একদিন কম কলঙ্ক দিয়েছিল ওরা! তাঁর অপরাধ, দার্জিলিংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে তখনকার বঙ্গেশ্বর এণ্ডারসনের উপর যে আক্রমণ হয়েছিল, তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যিনি মেয়ে হয়েও সেদিন এমনি অমিত তেজে জ্বলে উঠেছিলেন, মহামান্য সভ্যশাসকদের কাছ থেকে তিনি এ ছাড়া আর কিই বা আশা করতে পারেন বল!

কিন্তু দেশবাসী! না দেশবাসী আজও সেই বীরাঙ্গনা উজ্জ্বলা মজুমদারকে ভোলে নি। ওঁরা সবার নমস্যা।

ননীবালা দেবীর কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি মল্লিকা। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সেদিন সুসভ্য ব্রিটিশ শাসক এই নিষ্ঠাবতী

বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে লঙ্কাবাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অপরাধ? অপরাধ মারাত্মক।

বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পিস্তলটা! কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছেন ওটাকে। ওটা যে এখুনি চাই।

অসাধ্য সাধন করলেন ননীবালা দেবী। রামবাবুর স্ত্রী সেজে সোজা তিনি জেলে গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে পিস্তলটি তুলে দিলেন সহকর্মীদের হাতে।

অবশেষে একদিন ধরা পড়লেন ননীবালা দেবী। তারপরই শুরু হল ঐ অকথ্য নির্যাতন।

কিন্তু পেল কি তাঁর কাছ থেকে কোন সদুত্তর?

অপমানে, অত্যাচারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্ঞানহারা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, তবু পেরেছেন কি কেউ তাঁকে তার আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত করতে?

নারীত্বের চরম অবমাননার পরে পুলিশ অফিসার তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—বল, এখনো সব কথা খুলে বলবে কিনা?

—না, বলব না। একই ভাবে উত্তর দিলেন বিপ্লবীদলের সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া পিসীমা ননীবালা দেবী।

—এখনো বলবে না! গর্জে উঠলেন পুলিশ অফিসার।

—না বলব না। কিছুতেই বলব না। কোনমতেই বলব না।

অবশেষে একদিন টনক নড়ল আই. বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ গোল্ডির।

শুধু একটি চড়। পিসীমার হাতের একটি চড় খেয়েই নারীকে লাঞ্ছনা আর নির্যাতন করার একান্ত বাসনা তার ঘুচে গিয়েছিল জন্মের মত। আর কোনদিন ভুলেও তিনি বিদ্রোহী পিসীমাকে ঘাঁটাতে চেষ্টা করেন নি।

অবশেষে একদিন মুক্তি পেলেন পিসীমা। দেশের জন্য এই নির্যাতনের বিনিময়ে সেদিন কি মূল্য পেয়েছিলেন তিনি ?

বিরাট পৃথিবীতে মাথা গোঁজার মত একটু ঠাঁইও তিনি পেলেন না কোথাও। নির্বান্ধব পৃথিবীতে তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার।

সূর্য সেনকে আশ্রয় দেবার অপরাধে বিধবা সাবিত্রী দেবীকেই কি কম লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল সেদিন ?

জেলের এক কোণে মা, অন্য কোণে ডাণ্ডাবেড়ি-পরা অবস্থায় যক্ষা রোগগ্রস্ত ছেলে রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। মা ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে চাইলেন, কিন্তু নির্মম শাসনকর্তারা এতটুকুও টললেন না।

অবশেষে দেখতে দেওয়া হল মৃত্যুর পরে। আশ্চর্য, তখনো রামকৃষ্ণ তার দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে ডাণ্ডাবেড়ি থেকে মুক্তি পায়নি।

যথাসময়ে সাবিত্রী দেবীও একদিন মুক্তি পেলেন, কিন্তু অবস্থা দাঁড়াল ঐ পিসীমার মতই। কেউ নেই তাঁর, কেউ নেই। পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী নয়।

মল্লিকা, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই হিসাব-নিকাশের পালাও শুরু হয়েছে বেশ ঘটা করেই।

সবারই এক দাবি। অর্থাৎ, স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমার দানই সর্বাধিক, সুতরাং অন্য সবার চাইতে আমাকে তোমরা একটু বেশী সুবিধা দিতে বাধ্য।

এমন কি আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসায়ীরাও তার ব্যতিক্রম নন।

সেদিন এই বাংলাদেশের বুকে বসেই তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দজীর উপস্থিতিতে তাঁরা এই বলে তাঁদের ফিরিস্তি দাখিল করেছেন

যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যা করেছেন, এমনটি নাকি আর কেউ কোন দিনই করেনি। সুতরাং কিছু সুবিধা তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য।

আজ যখন এসব দেখি আর শুনি, তখন ননীবালা দেবী, সাবিত্রী দেবী ও এমনি লক্ষ লক্ষ সর্বহারা দুঃসাহসিনীর কথাই মনে পড়ে বার বার।

ওঁরা ওদের হিসাব মেলাতে পারেন নি। সে চেষ্টাও করেন নি কোনদিন। তাই দুর্ভাগ্য ওঁদের নিত্যসঙ্গী হয়েই রইল চিরদিন।

মল্লিকা, তোমরা একালের মেয়ে! পরাধীনতার যে কি তীব্র জ্বালা, সে অনুভূতি তোমাদের নেই। সে দুঃসহ জ্বালায় ওরা জ্বলেছেন চিরদিন।

ওঁদের তোমরা শ্রদ্ধা করো। প্রণাম করো। নইলে অকৃতজ্ঞতার ইতিহাসে তোমরা মসীলিপ্ত হয়ে থাকবে চিরদিন। মনে রেখো,—আজ সারা দুনিয়ার সামনে স্বাধীনজাতি বলে তোমরা যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছ, সে স্বাধীনতা ওঁদের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ওঁদের তুলনা নেই।

সবাই এসে মিলিত হলেন খিদিরপুর পাইপরোডের মোড়ে।

নিউ পার্কস্ট্রীট থেকে এলেন দীনেশ, বাদল আর নিকুঞ্জ সেন। রাজেন গুহের বাড়ী থেকে রসময় শূর আর রাজপুত্তুর।

সাবধানতা হিসেবে আগের দুটো ট্যাক্সীই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে আর একটা নূতন ট্যাক্সী।

এবার যাত্রা শুরু।

ইঙ্গিত করতেই ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলল ডলেহৌসী স্কোয়ারের দিকে।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন তাকিয়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত।

বিপ্লবীজীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তাদের চলে না। তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞাতেই বুঝি চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে বারবার।

ঐ যে ওরা চলে যাচ্ছে।

আর কোনদিনও ওরা ফিরে আসবে না। হাজার ডাকলেও আর কোনদিন ওদের সাড়া পাওয়া যাবে না।

বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়।

বিনয়-বাদল-দীনেশ, তোমাদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন ব্যর্থ হবে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই চরম আত্মবিসর্জনের কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও হাসিমুখে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল। মেজর বিনয় বোস, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাদল।

মেজর, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও ক্যাপ্টেন নিজের মনগড়া উপাধি নয়! জলন্ধর থেকে ডাকযোগে পাওয়া কোন উপাধিও নয়।

দু'বছর আগে কষ্টকর সামরিক কৌশল প্রদর্শন করে এ উপাধি তাঁরা অর্জন করেছেন, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের অভিজ্ঞ বিচারকদের কাছ থেকে।

প্রথম টার্গেট্ কারাবিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসন।

কিন্তু কেন? গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এমনি আরো তো কত শ্বেতাঙ্গ শাসকইতো সেদিন ছিলেন বাংলা দেশে। তা হলে সিম্পসন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত নেবার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আরো কয়েক মাস পিছিয়ে যেতে হবে মল্লিকা।

১৯৩০ সন। এপ্রিল মাস।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেলে সেদিন আর তিল ধারণেরও জায়গা নেই। তবু আসছে। রোজই আসছে দলে দলে। ঝাঁকে ঝাঁকে।

কিন্তু স্থান কোথায়? কোথায় রাখা হবে নিত্য নূতন এই বন্দীর দলকে?

জেল-সুপার সোমদত্ নির্বিকার। দিব্বি তিনি সত্যাগ্রহী বন্দীদের ঢুকিয়ে দিলেন তৃতীয় শ্রেণীর চোর-গাঁটকাটাদের দলে।

সত্যাগ্রহী বন্দীর দল তাতে রাজী নয়। ওদের সংগে আমরা থাকবো না। তাছাড়া ওসব কুর্তা জাঙিয়াও আমরা পরব না।

পরতে হবে। গর্জে উঠলেন জেলার সোম্‌দত্, তাছাড়া থাকতে হবে তোমাদের ওদের সংগেই।

কক্ষণো না। বলো ভাই সব—বন্দেমাতরম্।

বটে! এতবড় সাহস। সংগে সংগে সোম্‌দত্ এর নির্দেশে জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল ঢং ঢং করে।

ছুটে এল সার্জেন্ট, হাবিলদার, ওয়ার্ডার, মেট্রন ও সশস্ত্র পুলিশের দল। কি ব্যাপার। হঠাৎ এই পাগলা ঘন্টি কেন?

—সবাইকে লক্‌আপে বন্ধ কর। জলদি।

ওদিকে ততক্ষণে নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুভাষচন্দ্র; জে, এম, সেনগুপ্ত; সত্য বক্সী প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ। কি ব্যাপার! এত গোলমাল কিসের?

—জলদী যে যার ওয়ার্ডে ফিরে যাও। দেখেই হুঙ্কার দিলেন সোম্‌দত্, আমার হুকুম। আর এক মিনিট ও কারো বাইরে থাকা চলবে না।

গ্রাহ্যই করলেন না কেউ। ওসব পুলিসী হুঙ্কার তাদের ঢের ঢের দেখা আছে।

—তবে রে! আচ্ছা দেখাচ্ছি তোমাদের মজাটা। চার্জ···

আদেশ পেয়ে সংগে সংগে ঝাপিয়ে পড়ল হিংস্র পশুর দল। তারপর শুধু প্রহার আর প্রহার। একটানা প্রহার।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীর সর্বত্র।

আলিপুর জেলে লাঠি চার্জ। সুভাষচন্দ্র গুরুতর আহত। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত।

বটে! দলীয় নির্দেশে সংগে সংগে বীরেন ঘোষ ও অন্য একজন বিপ্লবী বেরিয়ে পড়লেন গুলীভর্তী রিভলবার পকেটে নিয়ে। কোথায়

সোম্‌দত্‌। নিজের রক্তদিয়েই তাকে সুভাষচন্দ্রের এই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তার ক্ষমা নেই।

টের পেয়ে সংগে সংগে পাঞ্জাবী বীরপুঙ্গব বাংলা দেশ ছেড়ে হাওয়া। আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই বাপু। ঢের হয়েছে।

সংগে সংগে প্ল্যান পরিবর্তন করলেন বি, ভি-র কর্মকর্তাগণ। সোম্‌দত্‌ পালিয়েছে,—যাক্‌। কি হবে মশা মাছি মেরে হাত কালো করে। তাছাড়া সেতো আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। সুতরাং ধরতে হবে একেবারে আসল লোককে, যার ইঙ্গিতে আলিপুর, মেদিনীপুর ইত্যাদি বাংলার বিভিন্ন কারাগারগুলিতে এই পৈশাচিক নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কে কেই লোক ?

কর্ণেল সিম্পসন।

বাংলার কারা বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল সিম্পসন।

গাড়ি ছুটে চলেছে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশঃ।

ভেতরে স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে আছেন তিন মুক্তি-সৈনিক। বুকে তাঁদের দুর্বার সাহস। চোখ দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আঘাত হানতে হবে। চরম আঘাত হানতে হবে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে।

যত বাধাই আসুক না কেন, সবকিছুকে পর্যুদস্ত করে বুক টান করে এগিয়ে যেতে হবে। ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে।

হ্যাঁ, তার জন্য চরম মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। দেবেও।

ব্রিটিশ শক্তির সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে ফিরে আসার প্রশ্নই ওঠে না। সে চেষ্টাও তারা করবে না।

তবে তার আগে দেখিয়ে দিতে হবে যে, স্বাধীনতার সৈনিক কোনদিনও মৃত্যুকে ভয় পায় না। দেখিতে দিতে হবে পরবর্তীকালের মুক্তি-সৈনিকদের যে, ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। এমনি করেই চরম মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়।

আমাদের পালা শেষ। এবার তোমরাও এস আমাদের এই ফেলে-যাওয়া রক্তরেখা অনুসরণ করে।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। লগ্ন সমাগত। আর দেরি নয়। সামনেই রাইটার্স বিল্ডিং।

গাড়ি থেকে নেমে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল মুক্তি-সৈনিকের দল।

প্রহরীরা তটস্থ। সে কি তাদের সেলামের ঘটা!

আরে বাসরে বাস! পোশাকের কি বাহার! নিশ্চয় সদ্য বিলেত থেকে পাশ করে আসা কোন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের দল। অফিসের কাজে নিজ নিজ বিভাগের সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে হয় তো। বলা যায় না, ফেরার পথে টাকাটা, সিকিটা ছুঁড়ে দিলেও বা দিতে পারে।

একতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। বারান্দায় পা দিয়েই চাপা গলায় বললেন রাজপুত্তুর,—দীনেশ, বাদল আর ইউ রেডি?

—ইয়েস স্যার। সসম্ভ্রমে দলপতির কথায় জবাব দিলেন দীনেশ ও বাদল।

—মনে রেখো, প্রতিটি গুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া পকেটে পটাশিয়াম সায়ানাইড ঠিকমত রেখেছ নিশ্চয়ই?

—ইয়েস স্যার। চূড়ান্ত সংগ্রামের আগে অধিনায়ককে স্যাল্যুট দিয়ে সম্ভ্রম জানালেন দীনেশ ও বাদল।

—ভেরি গুড। গম গম করে উঠল রাজপুত্তুরের কণ্ঠ, এবার

তাহলে শুরু করা যাক। মনে রেখো, আমাদের ফার্স্ট ভিক্‌টিম কর্ণেল সিম্পসন।...

অ্যাটেনশন! ফরোয়াড মার্চ। রাইট-লেফ্‌ট্‌, রাইট-লেফ্‌ট্‌, রাইট-লেফ্‌ট্‌।

গট্‌ গট্‌-গট্‌ গট্‌-গট্‌ গট্‌।

তালে তালে পা ফেলে সিম্পসনের ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন বাংলা মায়ের তিন দামাল ছেলে।

তারা আজ দুর্বার। মরিয়া। বেপরোয়া। কেউ পারবে না আজ তাদের গতিরোধ করতে।

বেলা তখন বারোটা বেজে পাঁচ।

ঘর আলো করে বসে আছেন কর্ণেল সিম্পসন। কাছেই দাঁড়িয়ে তার একান্ত সচিব জ্ঞান গুহ।

কানে আসছে দূরাগত পা ফেলার শব্দ।

কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

পা ফেলার ধরন দেখে মনে হয় মিলিটারী অফিসার হবে হয়তো। আরো এগিয়ে আসছে। আরো।

হ্যাঁ, তোমার মৃত্যুদূত এগিয়ে আসছে কর্ণেল সিম্পসন। অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে সেদিন তুমি মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে লাঞ্ছিত করেছিলে। আজ তার কি জবাবদিহি করবে? চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

জবাব আর দিতে হল না। তার আগেই আগুন ঝলসে উঠল তিন তিনটে পিস্তলের মুখ দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সিম্পসন এলিয়ে পড়লেন চেয়ারের গায়ে। জবাব দেবার প্রয়োজন তাঁর চিরদিনের মতই ঘুচে গেল।

ঘরের মধ্যে আচম্বিতে একটা বজ্রপাত হয়ে গেল যেন।

ভয়ে আতঙ্কে প্রতিটি প্রাণী দিশেহারা। কি সর্বনাশ! দরজায়

দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। হাতে তাদের উদ্যত অগ্নি-নালিকা। এখনো তাদের নলগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প অল্প।

প্রথম আঘাত শেষ হয়েছে। এবার কার পালা?

কিন্তু না, এখানে কাজ শেষ। অধিনায়কোচিত কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ দিলেন রাজপুত্তুর, অ্যাবাউট্ টার্ণ। নেক্সট্ ভিকটিম্ হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান মার। গো ফরোয়ার্ড।

গট্-গট্-গট্-গট্। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তাঁরা ঢুকলেন।

বাধা দিলেন একজন ইংরেজ সেক্রেটারী। যাকে বলে আলোর মুখে পতঙ্গ। ফলে যা হবার তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাম।

ব্যাস্, হয়ে গেল। একটি গুলি। মাত্র একটি গুলিতেই বাধা দেবার শখ মিটে গেল বীরপুঙ্গবের।

ঝড় উঠেছে রাইটার্স বিল্ডিং-এর বুকে। উদ্দাম ঝড়। এ ঝড়ের গতিরোধ করার সাধ্য কারোরই নেই।

চারিদিকে ভীত, আতঙ্কিত পলায়নপর জনতা। হৈ-হল্লা চিৎকার আর চেঁচামেচি।

পালাও। পালাও। বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও। আর মূহূর্তও এখানে নয়।

ঐ যে হোম সেক্রেটারীর অফিস। ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ল হোম ডিপার্টমেন্টের কাঁচের জানালাগুলো।

কোথায় আলবিয়ান মার! শুট হিম। এবার তার পালা।

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

গুলির শব্দে অকৃষ্ট হয়ে নিজের কক্ষ থেকে পিস্তল হাতে ছুটে এলেন ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ। এবার তাঁর পিস্তল গর্জে উঠল, ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! গুলির জবাবে গুলি। মৃত্যুর বদলে মৃত্যু। তাই মুক্তি-সৈনিকদের পিস্তলও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল মিঃ ক্রেগের পিস্তল।

আরে বাসরে! এ যে কেউটের ছোবল দেখছি! কে যাবে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঘোরে প্রাণটা দিতে।

বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়। তাই ক্রেগের পিস্তল নিয়েই এবার বাধা দিতে চেষ্টা করলেন অন্য একজন বীরপুঙ্গব মিঃ ফোর্ড।

কিন্তু সব বৃথা। কার সাধ্য ওদের সামনে এগোয়। ওরা মরীয়া, দুর্বার। বেপরোয়া।

এবার এলেন সহকারী ইনস্‌পেক্টর জেনারেল মিঃ জোনস্। তিনিও চালালেন কয়েক রাউণ্ড গুলি, কিন্তু কোন কাজেই এল না। বরং পাল্টা গুলিবর্ষণের প্রচণ্ডতা দেখে তিনিও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন সঙ্গে সঙ্গেই। মাই গড। ওদের সামনে থেকে আপাততঃ দূরে থাকাই সব চাইতে নিরাপদ!

'দিল্লী প্রাসাদ কূটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।'

লালবাজারের বাদশাজাদা চার্লস টেগার্টের তন্দ্রা সেদিন সত্যিই বার বার ছুটে যাচ্ছিল মল্লিকা।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে কেবলই চোখে পড়ে সেই বড় বড় লাল অক্ষরগুলো।

'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

কি মানে এই কথাগুলোর। এ কি কোন আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত!

অত্যাচারী শাসকরূপে কুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি অদূরদর্শী নন। এ-কথা বেশ ভাল করেই জানেন যে, আজ হোক, কাল হোক ব্রিটিশ-ভারতে ঝড় উঠবেই উঠবে। সেই দুরন্ত ঝড়কে প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোরই নেই।

রক্তের মত লাল ঐ অক্ষরগুলো কি সেই ভয়াবহ আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস?

সহসা চমকে উঠলেন টেগার্ট। এ কি! ইথার তরঙ্গে ভেসে আসছে এ কার কণ্ঠস্বর?

'হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

টেররিস্টরা রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেছে। তাদের গুলির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। প্লীজ হেল্প। হেল্প ইমিডিয়েটলী।

টেগার্ট স্তম্ভিত। নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এ যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ কাতর আর্তধ্বনি। ঘোষকের কথাগুলোর মধ্যে যেন তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

কিন্তু এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! লালবাজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দূরত্ব কতটুকুই বা। ডাকলেও বোধহয় শোনা যায়। তা সত্ত্বেও কিনা চোখের উপর এতবড় কাণ্ড!

এ যে অভাবনীয়, অকল্পনীয়। বিশ্বাসের অযোগ্য।

হেল্প! হেল্প! হেল্প! হ্যালো লালবাজার! হ্যালো ফোর্ট উইলিয়াম। প্লীজ, হেল্প ইমিডিয়েটলী। পুলিস ফোর্স চাই। মিলিটারী ফৌজ চাই। ইমিডিয়েটলী।

বিরাট পুলিশ-বাহিনী-সহ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন চার্লস টেগার্ট। ঝড় উঠেছে। উদ্দাম ঝড়। ঝড়ের এই প্রচণ্ডতায় আজ কে কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে!

গুলির শব্দে, ভীত আতঙ্কিত ব্রিটিশদের আর্ত-চিৎকারে নীচে তখন দস্তুরমত ভীড় জমে গেছে।

সবার চোখে-মুখে ব্যাকুল প্রশ্ন। কি ব্যাপার! ভূমিকম্প শুরু হল নাকি!

পাগলের মত ছুটে এলেন টেগার্ট। ছুটে এলেন ডেপুটি কমিশনার গর্ডন ও বার্ট। এলেন সহকারী ইনস্‌পেক্টর জেনারেল মিঃ জোন্স। সঙ্গে অগণিত সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী ফৌজ।

সর্বাগ্রে উঠে গেলেন চার্লস টেগার্ট।

ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে এই একটি মাত্র লোক, যিনি মৃত্যুভয়ে কোনদিনই ভীত নন। জীবনে এমন অনেক বারই তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা বলে কোনদিনই তিনি তাতে বিচলিত হননি।

পেছনে পেছনে গেলেন অন্যান্য অফিসার ও পুলিশ-বাহিনী। হাতে তাদের উদ্যত রাইফেল।

অবিশ্বাস্য। অভাবনীয়। চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

একদিকে সশস্ত্রবাহিনী সহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধুরন্ধরগণ, অন্যদিকে তিনটিমাত্র ভয়লেশহীন যুবক।

কতই বা তাদের বয়েস। বিনয়ের বাইশ, দীনেশের উনিশ আর বাদল সবেমাত্র আঠারোতে পা দিয়েছে।

কিন্তু কার সাধ্য তাদের সামনে এগোয়। পিস্তল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ছড়িয়ে চলেছে জ্বলন্ত সীসের গুলি। এর মধ্যে এক পা এগুনো মানেই মৃত্যু।

হার মানলেন টেগার্ট। হার মানলেন বিখ্যাত সব সমর-কুশলী ব্রিটিশ অফিসারবৃন্দ। চোখে তাদের ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি।

কে ওরা? কোথায় পেল ওরা এই অদ্ভুত সমর-কৌশল।

এ যে সাক্ষাৎ শমনের দল। এ অবস্থায় এগুনো মানে স্রেফ আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই হয় মল্লিকা। সংসারে মৃত্যুকে ভয় পায় না একমাত্র তাঁরাই যাঁরা সত্যিকারের স্বাধীনতার সৈনিক। কারণ তাদের কাছে মাতৃভূমির মুক্তির চাইতে বড় কাম্য আর কিছু নেই। তাই সাহসের ব্যাপারে মুক্তি-মন্ত্রে দিক্ষিত সৈনিক, আর পররাজ্যগ্রাসী লোভী দস্যু কোনদিনই এক হতে পারে না। হওয়া সম্ভবও নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তার নজীর নেই।

হল্ট! গোলাগুলির মাঝেই সহসা একসময়ে আদেশ দিলেন রাজপুত্তুর,—অ্যাটেনশন! এবারের ভিক্টিম পাসফোর্ট অফিস। মনে রেখো, আজ রক্ত দিয়ে ঋণশোধের পালা। সব ভেঙে, গুঁড়িয়ে তছ্‌নছ করে ফেলতে হবে। কাউকে রেহাই দেবে না!

গো ফরোয়ার্ড। কুইচ মার্চ। রাইট লেফ্‌ট—রাইট লেফ্‌ট।···

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! নিমেষে লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল পাসপোর্ট অফিস।

দৌড়! দৌড়। দৌড়। পালাও। পালাও!

—আরে। সহসা কি দেখে হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ, জলের পাইপ বেয়ে ঐ মোটা হোঁদলকুতকুতটা কে নেমে যাচ্ছে? পাদ্রী জনসন্। যাও বাবা, যাও। তুমি তো দেখছি ভয়েই আধমরা হয়ে গেছ। পালাও।

টেগার্ট বিচলিত। দিশেহারা। কি করা যায় এখন। এই রক্তপাগল ছেলেগুলোকে সামাল দেওয়া যায় কি করে?

শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল গুর্খা সৈন্যদলের। ওরাই এখন একমাত্র ভরসা

ধন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ! ধন্য তোমাদের সমরকৌশল। এত শক্তি নিয়েও মাত্র তিনটি বাঙালী যুবকের সামনে দাঁড়াতে না পেরে

অগত্যা তোমরা ডাকলে কি না সেই গুর্খা সৈন্যদেরই ; যাদের জো
বরাবরই তোমরা এমনি করে নিজেদের মুখ রক্ষা করে এসেছ।

বেশ, তাই ডাকো। কিন্তু পারবে কি ওদের জীবিত অবস্থা
করায়ত্ব করতে। বেশ, দেখো চেষ্টা করে।

শুরু হল নতুন অধ্যায়। একদিকে হাঁটু মুড়ে বসে পোজিশ
নিল অগণিত গুর্খা ফৌজ, অন্যদিকে তিনটি মাত্র যুবক।

একদলের হাতে শক্তিশালী রাইফেল, অন্যদলের হাতে স্ব
পাল্লার পিস্তল মাত্র ভরসা।

একদিকে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা গায়ে মেখে ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ সমর
বিদ্গণ, অন্য দিকে পরাধীন দেশের তিনটি মাত্র অগ্নি-শিশু।

শুরু হল যুদ্ধ। না, সংঘর্ষ নয়, যুদ্ধ। ইংরেজ মুখপাত্র স্টেটস্ম্যা
পর্যন্ত সেদিন এই মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে 'বারান্দা ব্যাট্‌
বলে আখ্যা দিয়েছিল।

দ্রাম! দ্রাম! দুম্! কটাক্! ক্রিক! দ্রাম! গুলির শ
কান পাতা দায়। দু'পক্ষই সমান। কেউ কম যায় না।

বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে।

চারিদিক অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না
গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনাও যায় না! তবু তারই মধ
থেকে মাঝে মাঝে মেঘগর্জনের মত রব ওঠে—'বন্দে মাতরম্!'

বন্দে মাতরম্!

ছোট্ট কথা। ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটির যে ক
অপরিসীম শক্তি, তা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে ন
মল্লিকা।

সেদিন অনেক রক্তই ঝরেছিল এই ছোট্ট শব্দটির জন্য। অনে
লাঞ্ছনা, অনেক অত্যাচার। তবু স্বাধীনতার বীজমন্ত্র এই ছো
শব্দটিকে সবাই প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিল মূল্যবান ঐশ্বর্যের মত।

এদিকে যুদ্ধ তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে।

রাজপুত্তুর মরীয়া। বেপরোয়া। চালাও। চালাও! মনে রেখে সারা দেশ আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সাফল্যের উপরই পরবর্তী কালের সংগ্রামী সৈনিকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং চালিয়ে যাও। জীবনপণ করে চালিয়ে যাও।

কে এলিয়ে পড়ল। জুডিসিয়াল-সেক্রেটারী মিঃ নেলশন্! বহুত আচ্ছা। চালিয়ে যাও সমানে।

এবার! এবার কে গেল? সেক্রেটারী মিঃ ট্যয়নাম্। শাবাশ লেফ্টেন্যাণ্ট। শাবাশ ক্যাপ্টেন। হাজার শাবাশ।

গোটা রাইটার্স বিল্ডিং জুড়ে তখন বিভীষিকার তাণ্ডব! যেদিকে তাকানো যায় শুধু পলায়নপর জনতা।

কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছে। কেউ টেবিলের নীচে আত্মগোপন করছে। কেউ বা কোন কিছু করতে না পেরে মেরীমাতার নাম করছে মনে মনে।

হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগল দীনেশের বাঁ হাতে। ভ্রূক্ষেপ ও নেই দীনেশের। দিব্বি হাসতে হাসতে তখন তিনি বললেন,—নেভার মাইণ্ড মেজর বোস। আই এম কোয়াইট্ ও. কে। ডান হাত তো ঠিকই রয়েছে।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন রাজপুত্তুর। এস্পার কি ওস্পার। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ডু আর ডাই।

দেখতে দেখতে রণাঙ্গন বিস্তৃত হয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত।

কখনো এখানে, কখনো ওখানে,—কখনো এ বারান্দায়, কখনো ও বারান্দায়—কখনো এ প্রান্তে, কখনো ও প্রান্তে।

তারই ফাঁকে ফাঁকে সব কিছু ছাপিয়ে সমবেত কণ্ঠে রব ওঠে, 'বন্দে মাতরম্!' চালিয়ে যাও। সাধ মিটিয়ে চালিয়ে যাও। তুমি এদিকটাতে লক্ষ্য রেখো ক্যাপ্টেন গুপ্ত। আমি বাঁ দিকটাতে দেখছি।

…কিন্তু একি! তুমি থামলে কেন লেফ্টেন্যাণ্ট?

—গুলি শেষ হয়ে গেছে মেজর। ম্লান মুখে জবাব দিলেন বাদল।

—তাইতো! একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজপুত্তুর, তোমার কাছে আর ক'টা গুলি আছে ক্যাপ্টেন?

—আর একটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। জবাব দিলেন দীনেশ।

—মাত্র একটা! একি! আমারও তো তাই রয়েছে দেখছি।

ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সামনের ঘরটাতে ঢুকে পড়তে চেষ্টা কর সবাই।

ভেরি কোয়ারফুল ক্যাপ্টেন। পিস্তলের নল যেন অন্যদিকে না ঘুরে যায়। ওটা ওদের দিকে তাক করে রাখ। কোন রকমেই ওদের কাছে আসতে দিলে চলবে না।

মনে রেখ, ইংরেজের আদালত আর যার জন্যই হোক না কেন, আমাদের জন্য নয়! তার আগে আমরা নিজেরাই নিজেদের সব কিছু ব্যবস্থা করে নেব। এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত লেফটেন্যান্ট?

—অভিমতের কোন প্রশ্নই ওঠে না মেজর।

পিস্তলের নলটা সোজা করে রেখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিল বাদল, আমি সৈনিক,—আদেশ পালন করতেই আমি অভ্যস্ত, দিতে নয়।

একে একে তিনজনেই ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে।

এবার দীনেশকে লক্ষ্য করে বললেন রাজপুত্তুর,—তোমার কিছু বলবার আছে ক্যাপ্টেন।

—আমার! হাসতে হাসতে জবাব দিলেন দীনেশ—আমার কথা তো বাদলই বলেছে। এ ছাড়া নতুন আর কিছু বলার নেই মেজর।

—অলরাইট। তাহলে আমার নির্দেশ শোন। তোমার পিস্তলে যখন গুলি নেই, তখন সায়ানাইডের পুরিয়া খুলে হাতে নাও বাদল। কুইক্! দীনেশ, তোমার পিস্তল রেডি! নাও, শেষবারের মত সবাই বল—বন্দে মাতরম্।

বন্দে মাতরম্। সমবেত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে বুঝি কেঁপে উঠল গোটা রাইটার্স বিল্ডিংটা।

—রেডি। অধিনায়ক রাজপুত্তুরের কণ্ঠে আদেশ শোনা গেল, অ্যাক্শন প্লীজ। ওয়ান-টু-থ্রী—

ড্রাম! ড্রাম! শেষবারের মত পিস্তল দুটো গর্জে উঠে হঠাৎ থেমে গেল। তারপরই তিনজনের দেহ একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে।

প্রথমেই গেলেন নিকুঞ্জ সেনের হাতে গড়া ছেলে বাদল।

সৈনিক-জীবনে আদেশ পালন করতেই তিনি অভ্যস্ত। তাই শেষ লগ্নেও তিনিই সর্বপ্রথম নেতার আদেশ শিরোধার্য করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

দীনেশ ও রাজপুত্তুর দু'জনেই গুরুতর আহত। দীনেশের গলার বাঁ দিকে গুলি ঢুকে গেছে। রাজপুত্তুরের গুলি বিদ্ধ হয়েছে কপালের দুইদিকে।

অবশ্য বাদলের মত তারাও সায়ানাইডের পুরিয়া মুখে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। কারণ, বিষ পেটে ঢুকবার আগেই তা গলাদিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ভেতরে আর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে এতক্ষণ বাদে বীরদর্পে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন টেগার্ট।

রাজপুত্তুরের তখনো কিছুটা জ্ঞান ছিল। তাকেই টেগার্ট প্রশ্ন করলেন,—কে তুমি?

—আমি! এক ঝলক প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল রাজপুত্তুরের সারা মুখে, আমার পরিচয় শুনলে তুমি খুশিই হবে চার্লস টেগার্ট। বিনয় বোসের নাম শুনেছ তো? আমিই সেই বিনয় বোস।

বিনয় বোস!

চোখ দুটো বারেকের জন্য ধক্ করে জ্বলে উঠল টেগার্টের। যাঁর ভয়ে বহু বিনিদ্র রাত্রি তাকে দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাতে হয়েছিল, এই সেই

বিনয় বোস। যাক এতদিনের দুঃস্বপ্নের পালা শেষ হয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত।

—তোমার সঙ্গীদের নাম কি? আবার প্রশ্ন করলেন টেগার্ট।

—বলব না। সঙ্গে সঙ্গেই আস্তে আস্তে রাজপুত্তুরের চোখ দুটো বুজে এল অনন্ত নির্ভরতায়, নিশ্চিন্ত আরামে!

এ ঘুম কি আর তার ভাঙবে কোনদিন? কে জানে?

এবার ব্রিটিশ পুলিশের বীরত্বের পালা। শুরু হল তৎপরতা। শুরু হল পোষাক-পরিচ্ছদ তল্লাসীর কাজ।

বাদলের পকেট থেকে কি বেরিয়ে এল জান মল্লিকা?

তাঁর বহুমূল্য পোশাকের পকেট থেকে বেরিয়ে এল সামান্য একটি খদ্দরের তৈরি ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা, যে পতাকার সম্মান রাখতে গিয়ে আজ তাদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন।

তৎপরতার এখানেই শেষ হল না। কড়া পাহারায় সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ ও রাজপুত্তুরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ডাকা হল শহরের সবচাইতে নামী চিকিৎসকদের। যেমন করে হোক ওদের বাঁচাতেই হবে।

আহা, ওরা যে একেবারে দুধের শিশু গো! শত হলেও দয়া-ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে তো!

স্রেফ ভণ্ডামী মল্লিকা। আসল মতলব কিন্তু ওদের অন্যরকম।

এ অবস্থায় ওদের মৃত্যু হলে ব্রিটিশ জাতির অহঙ্কারের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সুতরাং ওদের সুস্থ করে তুলে অবশেষে চরম শাস্তি দিতে হবে। ফাঁসীতে ঝোলাতে হবে।

সবাই দেখুক যে, আমাদের বিচারে যারা অপরাধী, তাদের আমরা

এমনি করেই কঠোর হস্তে সাজা দিয়ে থাকি। সুতরাং ভাল চাও তো সাবধান! আর যেন এগিয়ো না।

কিন্তু পারবে কি তোমরা আমার রাজপুত্তুরকে চরম শাস্তি দিতে? বেশ, দেখ চেষ্টা করে। তবে মনে রেখ যে, ওকে চিনতে এখনো তোমাদের অনেক বাকী আছে।

এদিকে খবর শুনে মহানগরী স্তম্ভিত। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল বিপুল জয়ধ্বনি।

ধন্য তোমরা! পরাধীন জাতির ইতিহাসে তোমরা যা দেখালে তার তুলনা নেই।

শাবাশ! শাবাশ তোমাকে বিনয় বোস। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছ-ছটো ক্ষেত্রে তুমি যে অসাধ্য-সাধন করেছ, তা একমাত্র তোমার পক্ষেই বুঝি সম্ভব। হাজার শাবাশ তোমাকে। হাজার শাবাশ তোমার সহকর্মী দীনেশ আর বাদলকে।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়।

সেই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সম্বন্ধে সেদিন সরকারী মুখপাত্র স্টেটসম্যান পত্রিকা যা লিখেছিল, তার হুবহু অনুবাদ তোমাকে আমি শোনাচ্ছি মল্লিকা। স্টেটসম্যান লিখেছিল:

'৯ই ডিসেম্বর ১৯৩০।...লেফটেনাণ্ট কর্নেল এন. এস. সিম্পসন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ জে. ডব্লিউ নেলশন পায়ে গুলির আঘাত পেয়েছেন। গুলির শব্দ শুনে ফাইনান্স মেম্বার মিঃ এ. মার দরজার কাছে ছুটে এসেছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত গুলিটি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু ডি. পি. আই.-এর আর্দালীটির

পায়ে গুলি লেগেছে। কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন একটি ঘটনা পথচারীদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে একমাত্র বুঝি চিকাগোর সেই গুলিবর্ষণের ঘটনার তুলনা করা চলে।'

এবার শোন আনন্দবাজারের বক্তব্য।

'গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তিন জন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বেলা ১২টা-১৫ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙালী যুবক কারাগার বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাস মুন্সির (পার্সোন্যাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট) সংগে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন।

যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাশি তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাঁহারা দেখা করিতে চায় তাহা যথারীতি এক টুকরো কাগজে লিখিয়া দিতে বলে।

যুবকগণ ইহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং চাপরাশিকে একপাশে ঠেলিয়া স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুত গতিতে কর্নেল সিম্পসনের প্রতি ৫।৬ বার গুলি নিক্ষেপ করে। গুলীর আঘাতে কর্নেল সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কর্নেল সিম্পসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়াবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাচের জানালায় এবং শিলিং-এ গুলী করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিব মিঃ

মারের অফিসের জানালায় গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে। মিঃ জে. ডব্লিউ নেলসনের অফিসেও গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে।

অতঃপর তাঁহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন আমেরিকানকে গুলী করে, কিন্তু গুলী ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশির গায়ে গুলী লাগে নাই।

অতঃপর আততায়ীরা নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার উরুতে গুলী করে। তাহার আঘাত গুরুতর নহে।

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি ওই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে।

আততায়ীগণ তিনজনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলী করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় তাঁহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতেছিল'।

[আনন্দবাজার : ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সন]

বাদল গত। তারপর একে একে তিনদিন কেটে গেছে, তবু পুলিশ তাঁর মৃতদেহ ছেড়ে দিতে রাজী নয়। আগে পরিচয় চাই, তারপর অন্য কথা।

অবশ্য একেবারে কিছুই যে জানা যায়নি তা নয়। বাদলের পকেটে বি. এন. দে নামাঙ্কিত একটা কার্ড পাওয়া গেছে, কিন্তু কে এই বি. এন. দে ?

আসল খবর জানা গেল তিনদিন বাদে।

সনাক্ত করলেন বরাহনগরের টি. গুপ্ত। বাদল আমার ভাইপো। ওর ভাল নাম সুধীর গুপ্ত। দীনেশ ও বিনয়ের মত তিনিও ঢাকা

বিক্রমপুরের অধিবাসী। গাঁয়ের নাম বিদগাঁও। অধুনা—পূর্ব শিমূলিয়া।

ওদিকে পুলিশী তৎপরতা তখন পুরোদমেই চলছে।

ডাক শুনে ছুটে এলেন নামী চিকিৎসকগণ। ছুটে এলেন শহরের সেরা সার্জন। যে করে হোক, ওদের বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু এ কি! রাজপুত্তুরের ডানহাতের আঙুলগুলোতে এভাবে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো কেন? ওর হাতে তো কোনরকম গুলির আঘাত লাগেনি। তবে কিসের ব্যাণ্ডেজ?

কাপুরুষ! কাপুরুষ! কাপুরুষ!

তুমি কাপুরুষ চার্লস টেগার্ট। জানি এজন্য কে দায়ী? দায়ী তুমি।

এই অগ্নি-শিশুকে ধরবার জন্য এতদিন কি অন্তহীন প্রচেষ্টাই না তোমরা করে এসেছ। বোধহয় রাজ্যের গোটা পুলিশ ও গোয়েন্দা-বাহিনীকে তোমরা এ-ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছিলে।

কিন্তু পেরেছিলে কি তাকে ধরতে? পেয়েছিলে কি তার নাগাল কোনদিন?

আজ সেই আহত বীর স্বেচ্ছায় তোমার হাতে ধরা দিয়েছে।

আর তুমি! তুমি কিনা এ-অবস্থার সুযোগ নিয়ে অচৈতন্য বীরের হাতের আঙুলগুলোকে বুট দিয়ে মাড়িয়ে ভেঙে দিয়ে নিজের পরাজয়ের জ্বালা মিটিয়েছ।

ধিক্ তোমাকে। শত ধিক্! তুমি কাপুরুষ নও তো কি!

মল্লিকা, এই প্রথম নয়। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের প্রতি এমনি বীরত্ব ওরা দেখিয়েছে অসংখ্যবার।

চট্টগ্রাম বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের কথাই ধরা যাক। গ্রেপ্তারের পরে রুগ্ন, অসুস্থ মাষ্টারদার উপর কি নির্মম অত্যাচারই না করেছিল এই হিংস্র পশুর দল!

বিশেষ করে তাঁকে অন্তিম মুহূর্তে ওরা যা করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও বুঝি তার তুলনা মেলে না।

ফাঁসী কাঠে ঝোলাবার পূর্ব মুহূর্তে কখনো কোন বন্দীকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে, এমন কথা কোনদিনও শুনেছ কি ?

ব্রিটিশ শাসকেরা তাও সেদিন করেছিল। আঘাতে আঘাতে মাস্টারদার সবগুলো দাঁতই সেদিন ওরা তুলে নিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ওরা ফাঁসী দিয়েছিল মাস্টারদাকে নয়, তাঁর রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত অচৈতন্য দেহটাকে।

একই সঙ্গে ফাঁসীর বন্দী বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের ভাগ্যেও সেদিন জুটেছিল তাই। ফাঁসীর পূর্বে নির্মম বুটের আঘাতে সেদিন ওরা তারকেশ্বরের একটা চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল।

ভারতে এই হল অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সত্যিকার স্বরূপ।

শুধু কি ভারত ! বর্মায় কি করেছিল শুনবে।

একই সঙ্গে ওরা ফাঁসী দিল বাহাত্তর জন মুক্তি-সৈনিককে। তারপর তাদের মুণ্ডগুলো আলাদা করে কেটে নিয়ে, তার ছবি তুলে, ছড়িয়ে দিল বর্মার সর্বত্র। অর্থাৎ, সাবধান। নইলে তোমার ভাগ্যেও এই জুটবে।

বস্তুতঃ, ব্রিটিশের এই নির্মম অত্যাচার থেকে সেদিন কারোরই রেহাই ছিল না মল্লিকা।

দেশপ্রেমের অপরাধে ধৃত এমন একটি প্রাণীও বোধহয় ছিল না, টেগার্টের পাশবিক নির্যাতন যাকে সহ্য করতে হয়নি। এমন কি মেয়েরাও বাদ যায়নি।

অথচ এর বিপরীত চিত্র দেখো। যে চট্টগ্রাম-বিপ্লব দমন করার জন্য সেদিন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না, ঘটনাটা ঘটেছিল তখনই। এ কাহিনীর নায়ক বীর-বিপ্লবী লোকনাথ বল। এ-কাহিনী আমার তাঁর কাছ থেকেই শোনা।

১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল। স্থান চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার। রাত ঠিক দশটা। সহকারীদের নিয়ে অধিনায়ক লোকনাথ বল হাজির।

যে যেখানে আছ সরে দাঁড়াও। বেঘোরে প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের কাজ আমরা করবই।

উপস্থিত বাহাত্তর জন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এসব ডাকু ছেলেদের পিস্তলের সামনে দাঁড়ানোর চাইতে আপাততঃ গা-ঢাকা দেওয়াই নিরাপদ।

উপদেশে কর্ণপাত না করে পিস্তল খুলে বাধা দিলেন সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল। অধিনায়কের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এবার লোকনাথ বলের পায়ের কাছে এসে ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস ফেরেল। আমাকে ও আমার এই শিশুটাকে তুমি বাঁচতে দাও।

কি উত্তর দিলেন লোকনাথ বল জান মল্লিকা!

উত্তর দিলেন,—'আমি দুঃখিত সিস্টার। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি বা আমার কোন লোক তোমার এতটুকুও অমর্যাদা করবে না সিষ্টার।'

যে ব্রিটিশশাসক সেদিন আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে নারীর মান-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি, তাদের দেশেরই একটি মহিলাকে সেদিন সম্মান দেওয়া হল সিস্টারের মর্যাদায়।

দিলেন তাঁরাই, ওদের ভাষায় যারা বহুনিন্দিত দেশের সন্ত্রাসবাদী ছাড়া আর কিছু নন।

তাহলে কে বড় মল্লিকা? সুসভ্য ব্রিটিশ শাসক চার্লস টেগার্ট, না তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী লোকনাথ বল?

কিন্তু এই করেই কি তুমি মুক্তিমন্ত্রে-দীক্ষিত স্বেচ্ছাবন্দী বিনয় বোসকে চরম শাস্তি দিতে পারবে টেগার্ট?

না, পারবে না। প্রমাণ! প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবে।

প্রমাণ দু'দিন বাদেই পাওয়া গেল মল্লিকা। ইতিমধ্যে দুজনের অবস্থাই ভালর দিকে চলেছে। মনে হয়, চিকিৎসার গুণে এ-যাত্রা হয়তো বেঁচে যাবে।

কিন্তু এ কি? সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন চিকিৎসক দল।

সর্বনাশ! বিনয় বোসের মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা কেন! ক্ষতস্থানে একটা গভীর গর্তই বা দেখা যাচ্ছে কেন? কে করেছে এমন কাজ? কে করেছে?

কে আবার! করছেন রাজপুত্তুর নিজেই।

ব্রিটিশ তাঁর শত্রু। জীবনে যাদের তিনি সবচাইতে বেশী ঘৃণা করেছেন, তাদের আওতায় থেকে, তাদের দেওয়া সামান্য সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। অথচ এ অবস্থায় কোন উপায়ও নেই। সুতরাং এ দুঃসহ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। নিজে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কৃতি-ছাত্র। এ-অবস্থায় কি করলে কি হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই নিজেকে নিঃশেষ করার জন্য এই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই কখন তিনি মাথার ক্ষতস্থানের মধ্যে গভীরভাবে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

ফলে সেপ্‌টিক। ঘা দস্তুরমত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিকারও শুরু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

চিকিৎসকদের মুখ গম্ভীর। কখন কি হয় বলা শক্ত। জোর করে কিছু বলা মুশকিল। তাছাড়া প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

গম্ভীর চার্লস টেগার্টও। তবে কি হাতে এসেও ফসকে যাবে লোকটা? তাহলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মান-মর্যাদা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

পাঁচদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি, কিন্তু অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বরং জীবনী-শক্তি যেন কমেই আসছে ক্রমশঃ।

রাজপুত্তুরের বাবা মা দুজনেই এসে গেছেন। সদাশয় সরকার তাঁদের শেষ দেখা দেখতে অনুমতি দিয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে।

তবে অনুমতি এত সহজে মেলেনি। তার জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বিস্তর।

খবর পেয়ে প্রথমেই জামসেদপুর থেকে ছুটে এসেছেন রাজপুত্তুরের বড় ভাই বিজয় বসু। তারপরই সোজা বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের আদালত। বিনয় আমার ছোট ভাই। তাকে শেষ দেখা দেখতে অনুমতি দেয়া হোক।

বিনয় বসুর ভাই! শুনেই ভয়ে থর থর কম্পমান মিঃ রক্সবার্গ। মাই গড। পকেটে বোমা পিস্তল কিছু লুকিয়ে রেখেছে কিনা কে জানে?

সেন্ট্রি, ইধার আও। জলদি খাড়া রহ ইধার।

শেষ পর্যন্ত মিলে গেল অনুমতি পত্র।

ইতিমধ্যে বাবা-মাও এসে গেছেন। সবাইকে নিয়ে বিজয়বাবু তক্ষুনি গিয়ে হাজির হলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বাদ সাধলেন ওখানকার কর্মকর্তাগণ। উঁহু, কাউকে দেখতে দেয়া হবে না। টেগার্ট সাহেবের হুকুম।

—কিন্তু আমার কাছে আদালতের হুকুমনামা রয়েছে।

—ওসব হুকুমটুকুম বুঝিনে। আগে টেগার্ট সাহেবের হুকুম চাই।

—কোথায় টেগার্ট? ডাকুন তাকে। আমি তার সংগে কথা বলবো।

—তার সংগে দেখা হবে না। তিনি গভর্ণর হাউসে ব্যস্ত আছেন।

—তাহলে আদালতের এই হুকুমনামা আপনারা মানতে রাজী নন?

—ওসব বড় বড় কথা বুঝিনে মশাই। ইচ্ছে হয়তো ডিঃ কমিশনার সাউথ ব্যানার্জী সাহেবের সংগে কথা বলে দেখুন গিয়ে।

সেখানেও সেই একই জবাব। অর্থাৎ,—নো হুকুম। আগে টেগার্ট, তারপর অন্য কথা।

অতঃপর এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার মিঃ রবার্টসনের দরবারে। ফল যথাপূর্বং। ওসব কোর্ট ফোর্ট বুঝিনে। হয় টেগার্ট সাহেবের অনুমতি নিয়ে আসুন, নয়তো সোজা পথ দেখুন।

তবে রে! এবার বাঙালের গোঁ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংগে সংগে বিজয়বাবু ফিরে গেলেন বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের আদালতে। এই রইল তোমার হুকুমনামা। হাকিমের চাইতে পুলিশের কথার দাম যেখানে বেশী, সেখানে কোন দরকার নেই এই ছেলেখেলার।

হোয়াট। শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মিঃ রক্সবার্গ।

সুরু হল প্রেষ্টিজের লড়াই। হু ইজ টেগার্ট। আমি যেখানে হুকুম দিয়েছি, সেখানে টেগার্ট মানা করবার কে? ঠিক আছে, আমি দেখছি।

এবার কাজ হ'ল। বাবা মাকে নিয়ে নির্বিঘ্নেই এবার বিজয়বাবু পোঁছে গেলেন রাজপুত্তুরের শিয়রে।

—বিনয়। বিনয়। রাজপুত্তুরকে দেখেই উন্মত্ত আবেগে তার মুখের উপর ঝুকে পড়লেন বিজয়বাবু, একবার তাকিয়ে দেখ। আমরা তোকে দেখতে এসেছি।

কোন সাড়া নেই। বেশ বোঝা যায় যে, বিদায়লগ্ন আসন্ন। শুধু অপেক্ষা। শেষ বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় মুহূর্ত। সেগুলো পার হবার জন্য ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

একটা বিমূঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি। উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী নিঃশব্দ, নিষ্কম্প। শুধু প্রধান চিকিৎসক নিজের মনেই যেন একবার বললেন,

আশ্চর্য। হাজার চেষ্টা করা সত্বেও এক ফোঁটা ওষুধ খাওয়ানো গেল না। খাওয়াতে গেলেই দাঁতে দাঁত চেপে জোর করে মুখ বন্ধ করে থাকে। সত্যই আশ্চর্য।

সবশেষে পাদরী সাহেব এলেন শান্তির ললিতবাণী শোনাতে।

অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। এ সময় যীশুর বাণী শোনাতে পারলে লোকটা ইহকালে না হোক, অন্ততঃ পরকালে হয়তো কথঞ্চিত রাজ-ভক্ত ভাল ছেলে হতে পারে।

বাইবেল হাতে নিয়ে সহসা কি শুনে রাজপুত্তুরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন পাদরী সাহেব। বিকারের ঘোরে রোগী বিড় বিড় করে কি যেন বকছে।

কিন্তু এ কি ?

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন পাদরী সাহেব।

কি সর্বনাশ! কাকে তিনি শান্তির বাণী শোনাবেন। রোগীকে! মৃত্যুপথ-যাত্রী রোগী উল্টে নিজেই তাকে ভয়ঙ্কর এক শান্তির বাণী শোনাতে শুরু করেছেন বিকারের ঘোরে।

এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যেও বিকারের ঘোরে ক্রমাগত তিনি বলে চলেছেন,—অ্যাটেনশন প্লীজ! ফরোয়ার্ড মার্চ। রাইট লেফ্ট— রাইট লেফ্ট—রাইট লেফ্ট—চার্জ! গো ফরোয়ার্ড!

বাইবেল বন্ধ করে পত্রপাঠ বিদায় নিলেন পাদরী সাহেব। খুব হয়েছে বাবা, আর নয়! এমন ছেলের কাছে যেন আর কোনদিনও তার ডাক না পড়ে।

অদূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পিতা রেবতীমোহন বসু।

না দুঃখ নয়! তিনি নিজে নামকরা শিকারী, জীবনে কোনদিনও তাঁর গুলি মিস্ হয়নি।

ছেলেও হয়েছে তেমনি বাপকা-বেটা। একটা গুলিও তার মিস্ হয়নি। দশজনের কাছে এমন ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিয়েও সুখ।

শিয়রে মা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যেন।

নিশ্চল পাষাণের মত সেই কখন থেকে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের শিয়রে। একটি কথাও বলেন নি। শুধু শেষ মুহূর্তে একবার ঝুঁকে পড়ে ছেলের মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকলেন,—আমি এসেছি খোকা। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ বাবা, আমি যে তোকে দেখতেই এমন করে ছুটে এসেছি।

আশ্চর্য! গত ক'দিনের মধ্যেও যার চেতনায় কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, মায়ের এই ডাক শুনে এবার যেন তার দেহটা বারেকের জন্য একটু নড়ে উঠল। সারা মুখে ফুটে উঠল এক ঝলক প্রসন্ন হাসি! তারপর একটু একটু করে কখন হাতটা কপালের কাছে উঠে গেল স্যালুটের ভঙ্গীতে। তারপরই সব শেষ।

নিজে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সৈনিক, তাই অন্তিমকালেও নিজের মাকে, জন্মভূমিকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত দেশবাসীকে তিনি সামরিক ভঙ্গীতেই স্যালুট জানিয়ে গেলেন বীর সেনানীর মত।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল বাংলাদেশ। মাথা নোয়াল ভারতবর্ষ। মাথা নোয়াল পৃথিবীর কোটি কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কণ্ঠে জেগে উঠল মহাকবির সেই অমর বাণী—

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

বিপ্লবীর মৃত্যু নাই। তার মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির অন্তরে বেঁচে থাকেন চিরকাল। বিনয় বোস আজ সেই ইতিহাসের নায়ক। তার মৃত্যু নাই। ক্ষয় নাই।

সত্যই ক্ষয় নাই। তার প্রমাণ মিলল পরদিন ভোরে।

দেখে চমকে উঠলেন চার্লস টেগার্ট। এ কি। আবার সেই পোস্টার। পোস্টারে পোস্টারে যেন ছেয়ে গেছে শহরটা।

তবে এবার ইংরেজীতে। লেখা রয়েছে—'বিনয়স্ ব্লাড বেকনস্ ফর মোর ব্লাড!'

অথৈ ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন চার্লস টেগার্ট। আরো রক্ত!—কি ভয়ঙ্কর কথা!

তবে কি ঝড় এখনো থেমে যায়নি! বিনয়ের ঘটনা কি শুধু তার সূচনা মাত্র। তাহলে কোথায় এর শেষ! কোথায় সমাপ্তি!

এবার সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শবদেহ নেবার পালা। সেখানেও ঝামেলা। প্রথমে বলা হয়—রাত আটটায় শবদেহ দেয়া হবে।

কিন্তু কোথায় কি! ক্রমে ক্রমে রাত দশটা বেজে গেল, তবু মহাপ্রভুদের সদয় হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অথচ মারা গেছেন সেই ভোর ছ'টায়।

আসল ব্যাপার জানা গেল পরে। ছেলেমেয়েদের মতিগতি ভালো নয়। এই নিয়ে কখন কি করে বসে ঠিক কি!

তাই শবদেহ দেয়া হবে অনেক রাত্রে, সবাই ঘুমোলে পরে। আর কোন রকম জনসমাবেশ করা চলবে না। কোন শ্লোগানও নয়। যেতে হবে নিঃশব্দে।

বেশ, তাই হবে। সর্ত অনুযায়ী নিঃশব্দেই শবদেহ নিয়ে বেরিয়ে এলেন বিজয়বাবু।

কিন্তু শহরবাসীর চোখে কি সত্যই ঘুম ছিল সেদিন! না, মোটেই না।

শহীদ বিনয় বোস আজ শুধু বিজয় বোসেরই ভাই নয়, আজ তিনি লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পরাধীন মানুষের পরম গর্বের ধন। তাই শবদেহ দেখেই হঠাৎ কোথা থেকে শত শত, হাজার হাজার মানুষ এসে ঝাপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত।

কণ্ঠে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি, বিপ্লবী বিনয় বসু জিন্দাবাদ। তাঁর মৃত্যু নেই। সে মৃত্যুঞ্জয়ী।

শুধু মানুষ আর মানুষ। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।

এমন কি পিতা রেবতীবাবু ও মা ক্ষীরোদবাসিনী দেবী পর্যন্ত তাঁদের বুকের ধনকে শেষ দেখা দেখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন মানুষের ভীড়ে। চোখে তাঁদের আনন্দাশ্রু।

সন্তানের বিয়োগব্যথা নিঃসন্দেহে দুঃখের, তবু এ মৃত্যু,—মৃত্যু নয়। সংসারের কেউ অমর নয়! সবাইকেই চলে যেতে হবে একদিন। কিন্তু মরেও মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে ক'জন ?

ধন্য বিনয়! তাঁর পিতা মাতা বলে পরিচয় দিতে পেরে তাঁরা নিজেরাও আজ ধন্য।

ক্রমশঃ শবযাত্রা এগিয়ে চলল নিমতলা ঘাটের দিকে। সবাই উদ্বেল। সবার কণ্ঠে নতুন শপথ। বিনয় বসু জিন্দাবাদ। তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলবো না।

এ প্রসঙ্গে রাজপুত্তুরের পিতা রেবতীমোহন বসু পরবর্তীকালে কি বলেছেন শোন :

"...আমরা যখন সকালে শ্রীমান বিনয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া হাজির হই, তখন শ্রীমান অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। আমরা সকলে একে একে বহুবার ডাকাডাকি করা সত্বেও সে কোনরূপ সাড়া দেয় নাই।

প্রায় ১৫-২০ মিনিট পরে যখন তাহার মা তাহাকে ডাকিতে ছিলেন, তখন আমাদের মনে হইল, সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমরা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি। কারণ তখন সে তাহার ডান হাতখানা উঠাইয়াছিল এবং ঐ ভাবে রাখিতে না পারায় তৎক্ষণাৎ হাতখানা পড়িয়া যায়। কাজেই আমরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই।

পরের দিন (১২-১২-৩০) তাহাকে আবার আমরা দেখিতে যাই। সেদিনও শ্রীমান বিনয় অজ্ঞান অবস্থায়ই ছিল। বহু ডাকা ডাকি করা সত্বেও তাহার কোন সাড়া শব্দ পাই নাই।

ডাঃ ইনচার্জ আমাকে জানাইলেন :

'He is detarmined to die, as he did not take a single dose of medicine nor a single dose of diet.'

সেদিনও আমরা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই।

যখন শ্রীমান বিনয়কে রাইটার্স বিল্ডিংস হইতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় তখন তাহার জ্ঞান ছিল।

তখন কয়েকজন সি-আই-ডি পুলিস আসিয়া বিনয়কে নানারূপ প্রশ্ন করিতে থাকে। যথা,—সে কলকাতায় কোথায় থাকিত,—ঢাকার ঘটনার পর সে কোথায় ছিল ইত্যাদি।

শ্রীমান বিনয় তখন উত্তেজিত হইয়া বলে :

I have saved your five thousand rupees and what more do you expect of me' ?

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে বেঙ্গল পুলিস পাঁচহাজার, এবং ক্যালকাটা পুলিশ পাঁচহাজার,—এই দশহাজার টাকা বিনয়কে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত ছিল। বিনয় সম্ভবত পাঁচহাজার টাকার কথাই জানতেন।)

শ্রীমান বিনয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৩-১২-৩০ তারিখে অতি প্রত্যুষে (৬ টায়) ভবলীলা শেষ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যায়।

তাহার মৃতদেহ পাওয়ার জন্য শ্রীমান বিজয় (প্রথম পুত্র) চীফ ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করিলে তিনি অর্ডার দেন যে রাত্রি ৮টার সময় মর্গ হইতে মৃতদেহ পাওয়া যাইবে এবং আমার ছেলে বিজয়কে গ্যারান্টি দিতে হয় যে রাস্তায় আমরা কোন ডিমনস্ট্রেশান করিতে পারিব না।

আমরা আমাদের লোকজন সহ রাত্রি ৮টার সময় মর্গে গিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু পুলিশ রাত্রি ১০ টা ১৫ মিনিটের পূর্বে আমাদিগকে মৃতদেহ দেয় নাই।

কোনরকম ডিমনস্ট্রেশান না করা সত্ত্বেও আমরা বিনয়ের মৃতদেহ নিয়া যখন নিমতলা ঘাটের দিকে যাইতে থাকি, তখন অসংখ্য লোক আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হয় এবং 'বিনয় বসু কি জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

আমাদের সংগে যে সমস্ত পুলিশ ইনস্পেক্টার ও পুলিশ কনস্টেবল ছিল তাহারা বাধা দেয় নাই বা দিতে পারে নাই।

...নিমতলা ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সকলের মুখেই এক কথা—'বিনয় বসু ও তাঁহার পিতা-মাতাকে দেখিতে চাই।'

"...আমরা যেদিন শ্রীমান বিনয়কে দেখিবার জন্য হাসপাতালে যাই, সেদিন শ্রীমান দীনেশকে তাহার পাশের বেডে রাখা হইয়াছিল, এবং সে আমাদের সকলকে দেখিতে ছিল। কিন্তু তাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই।"

রাজপুত্তুর চলে গেলেন। পেছনে পড়ে রইলেন এক অশ্রুমতী নারী বুকভরা বেদনার প্রতিমূর্তির মত। স্নেহের ভাইটি এ জীবনে আর কোনদিনই এসে আব্দার জানাবে না। দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়!

বিষ্ণুপুর-রাজারহাটের টীচার্স কলোনীতে গেলে রাজপুত্তুরের সেই দিদি ও রাজেনদাকে আজো তুমি দেখতে পাবে মল্লিকা।

বাড়ীর সামনে গেলে প্রথমেই তোমার নজরে পড়বে ছোট্ট একটি মন্দির। দেব মন্দির নয়, শহীদ মন্দির। ভেতরে দেখতে পাবে

অসংখ্য ছবি। ঠাকুর দেবতার ছবি নয়, শুধু শহীদদের ছবি। তাঁরাই ওদের ধ্যানজ্ঞান সব কিছু। তাঁরাই ওদের জীবন্ত বিগ্রহ।

কোনদিন ওদিকে গেলে অগ্নিযুগের সেই মহিয়সী বৌদি ও তাঁর স্থষ্ট এই শহীদ মন্দিরটি দেখে আসতে ভুলো না যেন।

বড় সাধ ছিল বাড়ির সামনে বিনয়-বাদল-দীনেশের একটি শহীদস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ওদের সাধ্য আর কতটুকু! তাই একক শক্তিতে সে শহীদস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করতে ওদের লেগেছে দীর্ঘ একুশ বছর।

পারতো ওখানে গিয়ে তোমার প্রণাম রেখে এসো।

বিনয়-বাদল-দীনেশ লিখতে বসে আজ কত কথাই না মনে পড়ছে বার বার। কত টুকরো টুকরো কথা। কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

বাংলা দেশে রাজপুত্তুর তখন হিরো। সবার মুখে এক কথা। 'বিনয় বোসের গুলী কোনদিনও মিস্ হয় না।'

সত্যই হয়নি। তার সবচাইতে বড় সাক্ষী ইতিহাস।

তবে কি পিতার মতই রাজপুত্তুর একজন দক্ষ শিকারী ছিলেন?

কস্মিনকালেও না। পিতার বন্দুক দিয়ে অনেক দিন, অনেক ভাবেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে আর কতটুকু?

তবে কি তিনি গোপনে গোপনে কোন রকম ট্রেনিং নিয়েছিলেন পিস্তল বা রিভলবার চালনা সম্বন্ধে?

না, তেমন কোন ট্রেনিং তিনি কোনদিনই নেননি।

তাছাড়া এই ট্রেনিং নেবার কাজটা তখনকার দিনে মোটেই সহজ ছিল না। সর্বত্র পুলিসের সন্ধানী চোখ। কোথাও একটু সন্দেহ জনক শব্দ হয়েছে কি ব্যস। সংগে সংগে পুলিস এসে হাজির। চলিয়ে এবার থানামে।

একমাত্র নিরাপদ জায়গা রেললাইন। দৈত্যের মত মেলগাড়ী

ছুটে আসছে দিক-বিদিক্ কাঁপিয়ে। শব্দ হলেও তখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। সব কিছুই চাপা পড়ে যাবে গাড়ীর শব্দের আড়ালে। সুতরাং চালাও এবার।

সেখানেও রাজপুত্তুর ব্যতিক্রম। কোনদিনই তাকে এ ধরনের কোন ট্রেনিং নিতে দেখা যায় নি। একটি দিনের জন্যও না।

তা হলে কিসের জোরে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ?

এর মূলে ছিল তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস। আর ছিল মানসিক প্রস্তুতি।

প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এক বছর আগে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে।

মেজর সত্য গুপ্ত আর রাজপুত্তুর, দুজনেই সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ ফিস ফিস করে বললেন মেজর গুপ্ত :

—আসরের বক্তাকে তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ বিনয় ?

—হ্যাঁ, পাচ্ছি।

—এখান থেকে এক গুলীতে তুমি ওর মাথার টুপিটাকে উড়িয়ে দিতে পার ?

—পারি।

—কি করে! তুমি তো কোনদিনও ট্রেনিং নাওনি।

—তা নিইনি, তবু পারি।

—তুমি নিশ্চিন্ত ?

—হ্যাঁ নিশ্চিন্ত।

হলও কিন্তু তাই। সত্যিই তাঁর গুলী কার্য্যকালে কোনদিনও মিস্ হয়নি।

কেন! কিসের জোরে!

কারণ, সেই মানসিক প্রস্তুতি। শক্তিমান ব্রিটিশ তাঁর শত্রু। তাদের বেলায় তিনি নির্মম ও ক্ষমাহীন। কিন্তু বনের অসহায়

পাখীগুলো সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাদের শত্রু মনে করার মত কোন কারণই থাকতে পারে না। স্বভাবতঃই মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে সে ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছুটা দুর্বল। অসহায়কে মারব কেন?

কিন্তু ঐ বন্দুকটি! পিতার যে বন্দুকটি নিয়ে রাজপুত্তুর মাঝে মাঝেই শিকার করতে যেতেন, সেই বন্দুকটি কোথা থেকে এল?

কে সেই বন্দুকটি দিয়েছিলেন রেবতীবাবুকে?

সে এক ভারী মজার কাহিনী মল্লিকা। সে কাহিনী আমাকে বলেছিলেন রাজপুত্তুরের বড়ভাই বিজয়বাবু নিজেই।

রেবতীবাবু তখন দেশের বাড়িতে। হঠাৎ একদিন তাকে যথা সর্বস্ব খোয়াতে হল সিঁদেল চোরের হাতে—ঘটি বাটি থালা বাসন ইত্যাদি সব কিছু।

অত্যন্ত জেদী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন রেবতীবাবু। সংগে সংগে তিনি এক কড়া চিঠি লিখে পাঠালেন পুলিসের বড় কর্তার কাছে।

এসবের মানে কি! চোর ডাকাতদের যদি তোমরা সায়েস্তা করতে না পারো, তবে কি লাভ এত এত পুলিস, কনেষ্টবল রেখে। এত চৌকিদারেরই বা দরকার কি? তার চাইতে সব তুলে দিলেই তো পারো।

যথাসময়ে সাহেব তার জবাব পাঠালেন রেবতীবাবুর কাছে। তুমি অবিলম্বে দেখা কর আমার সংগে। গাঁয়ের একজন গণ্যমান্য লোক হিসেবে তোমার একটি নিজস্ব বন্দুক থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাতে শুধু তুমি নয়, গাঁয়ের সবাই নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবে। চলে এসো। আমি সংগে সংগে লাইসেন্স ইস্যু করে দিচ্ছি তোমার নামে।

তাই করলেন রেবতীবাবু। চলে গেলেন সাহেবের কাছে। ফলে শক্তিশালী একটি দূরপাল্লার বন্দুক তিনি পেয়ে গেলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

সাহেবটি কে জানো মল্লিকা। স্বয়ং লোম্যান। তিনিই সেদিন নিজের মৃত্যুবানটি, নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, রেবতীবাবুর হাতে।

ভুলেও কি সেদিন তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে, তার দেয়া সেই মৃত্যুবানটি একদিন তাকেই গিয়ে আবার আঘাত করবে বুমেরাং-এর মত ?

হল কিন্তু তাই।

১৯৩০ সন। আগস্ট মাস।

গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে রাজপুত্তুর এসেছেন কলকাতায়।

ওদিকে আয়োজন তখন প্রস্তুত। লোম্যান এবং গভর্ণর, শীগ্‌গীরই ঢাকা যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এই সুযোগ। যে করে হোক, ওদের একজনকে ঘায়েল করতেই হবে।

দিন কয়েক আগেই কন্যা উজ্জ্বলা মজুমদারকে নিয়ে সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের সেই সুরেশবাবু পৌঁছে গেছেন ঢাকাতে।

উদ্দেশ্য, নতুন শক্তিশালী রিভলভারটি যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। পুরানো রিভলভারে বিশ্বাস নেই। কাজের সময় বিগড়ে যাবে কিনা কে জানে! সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল।

কিন্তু কেন! একা সুরেশবাবুইতো যথেষ্ট ছিলেন। তাহলে কেন তিনি সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন কন্যা উজ্জ্বলা মজুমদারকে।

কারণ, সাবধানতা। দিনকাল ভাল নয়। পথে ঘাটে কখন যে বিপদ ঘটে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই রিভলবারটি তিনি তুলে দিলেন কন্যা উজ্জ্বলা মজুমদারের কাছে। সাবধানে রেখো।

তারপর যা হবার ঠিক ত । যক্ষের মত কন্যা তাকে সারাটা পথ আগলে রাখলেন বুকে করে। এমনি করে পৌঁছলেন ঢাকাতে।

দলীয় নির্দেশে রাজপুত্তুর ও যথাসময়ে রওনা দিলেন ঢাকার

উদ্দেশ্যে। সেকি ভীড় সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে। কারণ, গভর্ণর! তিনিও সেদিন ঢাকা যাচ্ছেন, সেই একই গাড়ীতে।

গভর্ণর প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। রাজপুত্তুর চেপে বসলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। ট্রেনে তুলে দিয়ে দলের অন্যতম নেতা ভূপেন রক্ষিত রায় জানিয়ে দিলেন তাঁর শেষ নির্দেশ।

'হয় গভর্ণর, নয়তো লোম্যান। এ দুজনের একজনকে টার্গেট করা চাই-ই।'

যথা সময়ে রাজপুত্তুর পৌঁছে গেলেন ঢাকাতে। সেখানে এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য সুপতি রায়ের কাছ থেকে ও জানা গেল সেই একই নির্দেশ—দু'জনের একজনকে চাই।

কোথায় গভর্ণর! দু-দুবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু পুলিসের বেড়াজাল ভেদকরে কাছেই এগুনো গেল না।

১৯৩০ সন। ২৯শে আগস্ট।

ভোর বেলায় মেস থেকে বেরিয়ে যথারীতি হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলেন রাজপুত্তুর। এখানকারই চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তিনি। সুতরাং হাসপাতালে সর্বত্র তার অবারিত দ্বার।

কিন্তু একি। রাজপুত্তুর অবাক। এত পুলিস কেন আজ হাসপাতালে।

লোম্যান এসেছেন।

লোম্যান! বুঝি বারেকের জন্য চোখদুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল রাজপুত্তুরের। তারপরই কানের কাছে একটানা বেজে চলল সেই শেষ নির্দেশ।

'মনে রেখো, হয় গভর্ণর, নয় তো লোম্যান,—দুজনের একজনকে চাই ই।'

চট্ করে বেরিয়ে এলেন রাজপুত্তুর। অস্ত্র চাই। সামনেই

আরমানিটোলা। ওখানেই অস্ত্র রাখা হয়েছে। ছুটে গিয়ে এক্ষুনি সেই অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসতে হবে।

অবিলম্বে। আর দেরী হলে চলবে না।

অস্ত্র নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন রাজপুত্তুর। চোখে মুখে চিরকালের সেই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য। ভেতরে ভেতরে কি ভাবের আলোড়ন চলছে, বাইরে থেকে তা বোঝা শক্ত।

পরের ইতিহাস তো তুমি নিজেই জানো মল্লিকা।

স্বভাবের দিক থেকে রাজপুত্তুর ছিলেন চিরদিনই শান্ত, সমাহিত ও স্বল্পবাক। দেখে বোঝাই যেতোনা যে, তাঁর পক্ষে এমন কোন কাজ করা সম্ভব!

আর দীনেশ! ওরে বাপরে! ছেলেতো নয়, ঠিক যেন একটা বারুদের স্তূপ। শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা মাত্র। সত্যি বলতে কি, বি. ভি-র ইতিহাসে ও এমন দুরন্ত দুঃসাহসী ছেলে খুব কমই ছিল।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদি সব কিছু তখন বে-আইনী।

বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে দীনেশ একটা মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ঢাকা সদরঘাট থেকে নারান্দার দিকে।

কি করবে ওরা! বাধা দেবে! দিয়ে দেখুক না একবার। চেনেনাতো দীনেশ গুপ্তকে।

সত্যিই চেনে না। তাই সদর ঘাট চৌমাথার মোড়ে আসতেই হঠাৎ এক ভীমকায় পুলিশ হাবিলদার তার পথরোধ করে দাড়ালো বিরাটাকার ভূড়িটি নিয়ে। আভি মিছিল বন্ধ্ করো। হামারা ওয়াডার।

দীনেশ ছিলেন সবার পেছনে। মিছিল দাড়িয়ে যেতে দেখেই তাড়াতাড়ি তিনি ছুটে এলেন সামনের দিকে। কি ব্যাপার! মিছিল থেমে গেল কেন মাঝপথে!

—আভি নিকালো। দীনেশকে দেখেই দলনেতা ভেবে গর্জে উঠল হাবিলদার সাহেব, জলদি মিছিল হটাও। হামারা ওয়াডার!

—দুত্তরি তোর ওয়াডারের নিকুচি করেছে। সংগে সংগেই খপ করে হাবিলদার সাহেবের কোমরের বেল্ট চেপে ধরে আদেশ দিলেন দীনেশ, তোমরা সবাই মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে ওর মহড়া নিচ্ছি।

এই ছিলেন দীনেশ। আজকের কথা আলাদা, কিন্তু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোধহয় চিন্তা করাও কষ্টকর ছিল।

সত্যিই তাই। মিছিলে অংশ গ্রহণকারী দলীয় সদস্য শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষ (মুকুল) ও সেদিন একথা স্বীকার করেছেন বহুবার। 'দীনেশদার সত্যিই তুলনা নেই। সেদিনের সেই মিছিলের কথা আমি জীবনেও বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবে না।'

বাদল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। মাত্র আঠারো বছর বয়েস।

এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য নিকুঞ্জ সেন তখন বিক্রমপুর বানরী স্কুলের শিক্ষক। বাদল ছিলেন তাঁরই ছাত্র। উপযুক্ত শিক্ষকের উপযুক্ত ছাত্র।

১৯২৯ সন। বাংলার দিকে দিকে তখন নতুন দিনের সঙ্কেত।

ঠিক তখনই কংগ্রেসের উঁচু মহল থেকে বিশেষ একটি অনুরোধ এল বাংলার বিপ্লবীদের কাছে। তোমাদের একটু ঝুট-ঝামেলা করতে হবে ভাই। অবিলম্বে।

বিশেষ কিছু নয়, টেলিগ্রাম-টেলিফোনের তার কেটে দেয়া,—গু চার জায়গায় রেললাইন উপড়ে ফেলা—এই আর কি!

বাদল বি. ভি-র একনিষ্ঠ সৈনিক। তার নীতিই ছিল—কথা নয়, কাজ।

এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেলনা। সংগে সংগেই তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন দলীয় নির্দেশে। তারপর যা হবার ঠিক তাই দেখা গেল, কি টেলিগ্রাম, কি টেলিফোন, কোন কিছুর চিহ্নও নেই বিক্রমপুরে।

কে! কে! রে-রে করে ছুটে এল পুলিশবাহিনী। কে এ কাজ করেছে। নিশ্চয়ই বাদল ও রয়েছে ওদের মধ্যে। ধরো এবার বাদলকে।

কোথায় বাদল। ততক্ষণে তিনি বিক্রমপুর থেকে হাওয়া। দলীয় নির্দেশ ছিল তাই। সুতরাং তার উপর কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

আবার বাদলকে দেখা গেল রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক রূপে। সেখানেও তাঁর সেই একই চেহারা। কথা নয়,—কাজ।

দলনেতার নির্দেশ,—কাজ শেষ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সেখানেও সবার আগে বাদল। সৈনিকের ধর্মই যে তাই। কে-কি-কেন ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অবকাশ তাঁর কোথায়?

১৯৩০ সন। বাংগালী জুজুর ভয়ে ইংরেজ সেদিন থরথর কম্পমান।

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা। প্রমাণ প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সত্যরঞ্জন বক্সী নিজেই তিনি এ কাহিনী ব্যক্ত করেছেন ডালহৌসী স্কোয়ারে বিনয়-বাদল-দীনেশের শহীদস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দিবসে।

সত্যবাবু তখন লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদক। বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ টার্নেল ব্যারেট ছিলেন তাঁর লেখার অত্যন্ত ভক্ত। প্রায়ই তিনি আসতেন তাঁর অফিসে। সত্যবাবর সংগে

অনেক রকম গল্পগুজব করতেন দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে। কিন্তু ভুলেও কোনদিন ভাবতে পারেননি যে, যার সংগে তার এত হৃদ্যতা, সেই সত্য বক্সী আসলে বি. ভি-রই একজন অন্যতম প্রধান নায়ক।

৮ই ডিসেম্বর। যথাসময়ে বিনয়-বাদল-দীনেশ দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাইটার্স বিল্ডিংএর উপর।

কাণ্ড দেখে প্রতিটি ইংরেজ তখন দিশেহারা। বিশেষ করে সেই টাফনেল ব্যারেট। সংগে সংগে তিনি সব কথাই গুলিয়ে ফেললেন এক এক করে।

প্রথমেই ভীত কম্পিত স্বরে ডাকলেন—হ্যালো!

—ইয়েস। সাড়া এল অপর প্রান্ত থেকে, আমি সত্য বক্সী বলছি।

—ব-ব-ব বক্‌সী!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বক্‌সী। সত্যবাবু সবই জানতেন, তাই হাসি চেপে বললেন, কেন কি ব্যাপার!

—ব-ব-ব-বক্‌সী!

—ইয়েস, আমি বক্‌সী। কি হয়েছে বলুন!

—দে-দে-দে-দে হ্যাভ্ কাম্। দে-দে-দে হ্যাভ্ কাম। দে-দে—

—কাদের কথা বলছেন?

—দে-দে-দে হ্যাভ্ কাম। ওঃ!

—বুঝলাম, কিন্তু কি হয়েছে বলবেন তো!

—ওঃ! ব-ব-ব-বক্‌সী···দে-দে-দে হ্যাভ্ কাম!

—কি মুস্কিল! খুলে বলবেন তো সব কথা! কারা এসেছে?

—ব-ব-ব বন্দে মাতরম!

—বন্দে মাতরম! জোর করে হাসি হাসলেন সত্যবাবু।

—ইয়েস। ব-ব-বন্দে মাতরম-ওয়ালা। ব-ব-বন্দেমাতরম-ওয়ালা। দে-দে-দে হ্যাভ্ কাম। ওঃ!

মৃদুহাস্যে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করে ফোন ছেড়ে দিলেন সত্যবাবু। তাছাড়া উপায় কি! যা অবস্থা তখন ব্যারেট সাহেবের। এ অবস্থায় কারো সংগে কথা বলা যায় কখনো!

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন বাংলাদেশের সত্যিকারের ছবি। বাঙ্গালী নামটা শুনলেই হল। সংগে সংগেই তটস্থ। যাক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

বাদল গত। রাজপুত্তুরও বিদায় নিলেন ঐ ঘটনার পাঁচদিন বাদে। বাকী রইল শুধু দীনেশ।

দীনেশ তখন পাশের বেড-এ। শুয়ে শুয়ে সবই তিনি দেখলেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাদল আগেই চলে গেছে। আজ বিনয়দাও চলে গেলেন। নির্বান্ধব পৃথিবীতে পড়ে রইল সে একা।

দুঃখ! না না, কিসের দুঃখ!

বিপ্লবের পথ, অনিশ্চিতের পথ। এ পথে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। সঙ্গীরা চলে গেছে একে একে। এবার তার পালা। তাকেও একদিন যেতে হবে এমনি করেই। তার জন্য কিসের দুঃখ। কিসের ক্ষোভ! এ তো জানা কথাই।

দুঃখ পেলেন ইংরেজ সরকার। দারুণ দুঃখ।

আহা, কি আপসোস।

হাতের নাগালে এসেও কিনা দু-জন এমনি করে সটকে পড়ল। এ দুঃখ যে জীবনেও কোনদিন যাবে না।

যাক, এখনো একজন অবশিষ্ট আছে। ওর উপর কড়া নজর রাখতে হবে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়া হবে না। কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। শুধু ডাক্তার, আর নার্স।

অতি কষ্টে দেখা করার অনুমতি পেলেন দীনেশের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত। নসু যে তার বড় আদরের। তার এই অবস্থায় তিনি দূরে থাকবেন কি করে।

দাদাকে দেখেই দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল এক ঝলক প্রসন্ন হাসি। মা কেমন আছেন? আর বৌদি? খুকুদির খবর কি? আমার জন্য চিন্তা করতে মানা করবেন। আমি খুব ভাল আছি।

সত্যই দীনেশ ভাল হয়ে উঠলেন একটু একটু করে।

এ ব্যাপারে ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে সেদিন দীনেশকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাদের চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

সেই সঙ্গে একজন বিদেশিনী নার্সের কথা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

হোক বিদেশিনী, তবু তিনি নারী। তাই অজ্ঞাতেই বুঝি দুরন্ত, দুঃসাহসী এই দামাল ছেলেটির জন্য স্নেহ ও মমতায় মন তাঁর ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

কোন প্রত্যাশা নয়! কোন দাবিও নয়! শুধু দূর থেকে মাঝে মাঝে বন্দীকে একপলক চোখের দেখা মাত্র। এ ছাড়া সেদিন আর কিছুই বুঝি কাম্য ছিল না তাঁর।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দীনেশ একদিন রহস্য করে বললেন—'সরি নার্স, আয়াম ষ্টিল ব্রিদিং।'

'মে গড গ্র্যাণ্ট ইউ লং লাইফ।'

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে এবার এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন বিদেশিনী, 'হোয়াই ডিড ইউ টেক পয়জন অ্যাণ্ড শুট্‌ ইয়োরসেল্‌ফ্‌?'

হেসে দীনেশ উত্তর দিলেন—'জাস্ট্‌ টু ফিনিশ মাইসেলফ্‌ আফ্‌টার দা কমপ্লিশন অব ওয়ার্ক।'

—কমিটিং সুইসাইড ইজ এ ক্রাইম্‌। নো?

—ইট্‌ ওয়াজ নাথিং অফ্‌ এ সুইসাইড্‌। ইট্‌ ওয়াজ সেলফ্‌ ইমোলেশান্‌—এ ভলাণ্টারি ডেথ্‌—এ ডেথ্‌ অফ ফুল্‌ফিলমেণ্ট, অ্যাণ্ড নট্‌ অফ ডেসপেয়ার।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন বিদেশিনী —'ডু ইউ হেট্ মী? ডু ইউ হেট্ অল দি ব্রিটিশাস'?

—নো, আই হেট্ দোজ হু ওয়াণ্ট টু রুল ওভার আস্, ডাইরেক্টলি অর ইন-ডাইরেক্টলি।

—উইশ ইউ লং লাইফ। গুড নাইট, ব্রেভ বয়।

কথাটা বলেই পালিয়ে গেলেন বিদেশিনী। বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ। কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই রাজদ্রোহীকে প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানাবার অধিকার তার কোথায়! তিনি যে শাসক সম্প্রদায়েরই একজন।

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন দীনেশ।

এবার শুরু হল জেরা। হাজার রকম প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একে চেনো? ওকে জানো?

জবাব দিলেও রেহাই নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার সেই একই প্রশ্ন।

অসতর্ক মুহূর্তে একবার না একবার আসল খবর বেরিয়ে আসবেই।

কত বাঘা বাঘা বুড়ো মানুষ পর্যন্ত জেরার চোটে ঘায়েল হয়ে গেছে। এ তো বিশ বছরের নাবালক মাত্র!

মাঝে মাঝে রঙ বদলায়।

আহা, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে যে। কিছু খাবে?

না না, লজ্জা কি! আরে ভাই, আমিও এদেশের লোক। স্বাধীনতা কি আমি চাইনে! নেহাত চাকরি করি, তাই বাহিরে প্রকাশ করতে পারিনে। যাক, আমি জানলেও ক্ষতি নেই, তবে জ্যোতিশ জোয়ারদারই যে তোমাকে লড়াই করার কায়দা-কানুন শিখিয়েছে, তা যেন আর কাউকেই বলতে যেয়ো না। কি বল?

এমনি করে দিনের পর দিন জেরা, তবু রহস্যের দ্বার হল না।

হবার কথাও নয়। দীনেশ আলাদা ধাতুতে তৈরী। এমন ইস্পাত কঠিন ছেলেকে ভোলাতে চাইলেই কি এত সহজে ভোলান যায়?

তাছাড়া অগ্নিযুগের ইতিহাসে দীনেশ একাই যে গোটা একটা ইতিহাস। বিশেষ করে একটা গোটা সংগঠনের ব্যাপারে তিনি যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন, তার তুলনা কোথায়?

প্রমাণ মেদিনীপুর। কতই বা সেদিন বয়েস ছিল দীনেশের! ক'দিনই বা থাকতে পেরেছিলেন তিনি মেদিনীপুরে?

অথচ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেয়ে এরি মধ্যেই যেন ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠল মায়া কাঠির স্পর্শ পেয়ে।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, তাদের সংযত রাখা দায়। উন্মত্ত তরুণ রক্ত যেন অসহ্য আবেগে ফেটে পড়তে চায়।

কাজ চাই! কাজ চাই! আমরা বসে থাকতে রাজী নই! এখুনি কাজ চাই!

কাজের নেশায় প্রতিটি কর্মী উন্মাদ। প্রতিটি কর্মী উদ্দীপ্ত। কাজ দিন। সুযোগ দিন। একটি মাত্র সুযোগ।

মল্লিকা, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারাও পালটেছে। কিন্তু কোথায় সেই কাজের উন্মাদনা?

কোথায় সেই চরিত্রের দৃঢ়তা? কোথায় সেই আদর্শবাদ?

কোথায় সেই দুঃসাহসী যুবক-যুবতীর দল?

আজকাল অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই একমাত্র লক্ষ্য হল, যে করে হোক, সিনেমাতে একটা সুযোগ পাওয়া চাই। বেশী নয়, মাত্র একটা সুযোগ। তার জন্য যে-কোন মূল্য দিতেও তারা পিছপা নয়।

আর সেদিন! ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫। কতদিন আগের কথাই বা। কিন্তু কি ছবি সেদিন বাংলাদেশের!

সুযোগ তারাও সেদিন চাইত। তার জন্য তাদের সে কি তখন আকুলি বিকুলি। সে কি কান্নাকাটি! সে কি মান-অভিমান।

অথচ সেদিন সেই সুযোগ পাওয়ার অর্থ-ই ছিল,—অবধারিত মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুর ছাড়পত্রটুকু আদায় করার জন্যই কিনা এত সাধ্য-সাধনা।

সুযোগ পাবার জন্য দীনেশকেই কি কম সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছিল সেদিন। একদিন তো অভিমান ভরে বলেই ফেললেন, 'হয় কাজ দিন, নয় তো বলুন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

অনেক কষ্টে সেবার তাকে শান্ত করে বলা হল, 'অবুঝ হয়ো না দীনেশ। শান্ত হও। সাধারণ কাজের ভার দিয়ে তোমার মত ছেলেকে আমরা হারাতে রাজী নই। তোমার উপযুক্ত কাজ যেদিন আসবে, সেদিন নিশ্চয়ই তোমাকে ডাকা হবে।'

সেই উপযুক্ত কাজের ইতিহাস তো তুমি একটু আগেই শুনেছ মল্লিকা!

অভিমান কি রাজপুত্তুরেরই কম ছিল?

লোম্যান হত্যাকাণ্ডের আগে মেজদা হরিদাস দত্ত একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন:

—হাজার হোক, তুমি বড় লোকের ছেলে। দুদিন বাদে পাশ করে বিলেত যাবে, তারপর মেম বিয়ে করে দেশে ফিরবে। তখন কি দেশের কথা আর মনে থাকবে তোমার?

আরে বাসরে বাস! সে কি অভিমান রাজপুত্তুরের। ঠিক আছে, এখন কিছু বলবো না। সময় আসুক, তখন এর উপযুক্ত জবাব আমি দেবো।

জবাব তিনি সত্যই দিয়েছিলেন মল্লিকা। দিয়েছিলেন কাতরাসগড় কোলিয়ারীতে গিয়ে। একথা সেকথার পরে হঠাৎ সেদিন তিনি হরিদাস বাবুকে লক্ষ্য করে সলজ্জ হেসে বলেছিলেন :

—গুরুজনদেরও অনেক সময় বুঝতে ভুল হয়, তাই না মেজদা ?

—হ্যাঁ, হয়। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে গভীর আবেগে রাজপুত্তুরকে জড়িয়ে ধরে জবাব দিয়েছিলেন হরিদাসবাবু, একবার নয়, হাজার বার স্বীকার করছি যে, সেদিন আমার ভুল হয়েছিল। আজ আমার সবচাইতে বড় গর্ব এই যে, তুমি আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছ।

যাক, দীনেশের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

মেডিকেল কলেজ থেকে আলিপুর জেলের কনডেম্‌ড্‌ সেল। সাধারণতঃ ফাঁসীর আসামীদেরই এই কনডেম্‌ড্‌ সেলে রাখা হয়।

অবশেষে একদিন আলিপুরের সেসন জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাইবুনালে শুরু হল তার বিচারের পালা।

এ সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসাহ দেখা গেল না দীনেশের দিক থেকে। শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই তিনি জানিয়ে দিলেন বার বার —'ওসব জেনে আমার কি হবে ? আমি যা ভাল বুঝেছি,—করেছি। এবার ওদের বিচার ওরা করুক। তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

দীনেশের মাথা-ব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতীত, নিপীড়িত মানুষগুলির কিন্তু সেদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না মল্লিকা।

বিচারের দিন আদালত-প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতার সে কি বিরাট উত্তেজনা! সে কি অভাবনীয় চাঞ্চল্য!

সবাই চায় স্বাধীনতার বীর বিপ্লব দীনেশকে দূর থেকে একবার দেখতে। তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। দীনেশ যে তাদের বড় গর্বের ধন। অদৃষ্টে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

দীনেশ নির্বিকার। কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে জীবন কাটে তার একই তালে। সেখানে একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর, আর শান্ত বিকেল। উঁচু পাচীল-ঘেরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে সবকিছুই যেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, বৈচিত্র্যহীন।

কত কথা ভীড় করে আসে মনে। একটার পর একটা! অনেক কথা। অনেক আবেগ।

মনে পড়ে মা, খুকুদি, বৌদির কথা। মনে পড়ে ঢাকা ও মেদিনীপুরেব কথা।

মেদিনীপুর। ভাবতে ভাবতে একসময়ে পরিচিত মুখগুলো যেন চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে দীনেশের।

পরিমল রায়, অমব চাটার্জী, নরেন দাস, ফণী কুণ্ডু, বিমল দাশগুপ্ত, হরিপদ ভৌমিক, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ফণী দাস, প্রভাংশু পাল, ক্ষিতি সেন প্রফুল্ল ত্রিপাঠি, নবজীবন, রামকৃষ্ণ, ব্রজকিশোর, নির্মলজীবন এমনি কত নাম, কত পরিচিত মুখ।

ওরা কি ওদের দীনেশদাকে আজো মনে রেখেছে! কে জানে!

একটা নিঃসীম মুহূর্ত। তারপরই সহসা কি ভেবে দীনেশ গুণগুণ করে উঠলেন অভ্যাসমত।

'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি!
সকল খেলার করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি'

মৌন তপস্বিনী রাত্রি। কেউ জেগে নাই। মনে হয় গোটা পৃথিবী বুঝি তলিয়ে গেছে নিঝুম ঘুমের অতলান্তে।

শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে প্রহরীদের দূরাগত পায়ের শব্দ—খট্‌ খট্‌—খট্‌-খট্‌

এদিকে-ওদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে হঠাৎ কি ভেবে একসময়ে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। তারপরই ছোট্ট একটি নুড়ি দিয়ে পাথরের সেলের দেয়ালে আঘাত করলেন,—ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্।

আশ্চর্য, সংগে সংগে অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে এল—ঠুক্-ঠুক্—ঠুক্-ঠুক্।

খেলা নয় মল্লিকা, কোন ভৌতিক ব্যাপারও নয়। এ হল বিপ্লবী দের অতি-পরিচিত সাঙ্কেতিক লিপি। তখনকার দিনের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই সাঙ্কেতিক লিপিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

পাশের সেলে ছিলেন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী চট্টগ্রাম গ্রুপের রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। তার সঙ্গে এমনি করেই সেদিন দীনেশের ভাবের আদান-প্রদান চলত।

রামকৃষ্ণ সবেমাত্র গুরুতর রোগ ভোগ করে উঠেছেন, তাই সঙ্কেতিক ভাষায় দীনেশ প্রশ্ন করলেন,—এখন কেমন আছ রামকৃষ্ণ?

—একটু ভাল আছি দীনেশদা।

আর কোন প্রশ্ন নেই। কোন উত্তরও নেই। সব প্রশ্ন, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।

নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন সুভাষচন্দ্র।

আইন-অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের ভীড়ে আলিপুর জেল সেদিন জমজমাট।

সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, নিশি গাঙ্গুলী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, কেউ বাদ নেই।

হঠাৎ সুভাষচন্দ্র দাবি তুললেন,—সবাইকে নিয়ে আমি সরস্বতী পুজো করবো, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে মায়ের পায়ে অঞ্জলী দেবো।

দীনেশ, রামকৃষ্ণ, সবাইকে সে সুযোগ দিতে হবে। কাউকে বাদ দেয়া চলবে না।

জেলার মিঃ সোয়ান অবাক। বলে কি! কনডেণ্ড সেলের আসামীদের তিনি বাইরে আসার সুযোগ দেবেন কি করে?

জাতে তিনি আইরিশ। বেলফাস্ট জেলে ইতিপূর্বে এমন বহু বিপ্লবী তিনি দেখেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত দাবি এর আগে কোথাও তিনি শোনেন নি। এ যে একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু দাবি তুলেছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। সোজা লোক নন তো! হয়তো এ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। কাজ কি বাপু ঝামেলা করে! আমি তোমার হাতে বিশ্বাস করে সব ছেড়ে দিচ্ছি।

দেখো বাপু, আর যাই কর, আমার চাকরিটা যেন না যায়।

জেলার হলেও সোয়ন সাহেবের অন্তরটা ছিল সত্যিই বিরাট। আইরিশ বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ভারতের বিপ্লবীরা যে তাদেরই সগোত্র।

রামকৃষ্ণ ও দীনেশকে নিয়ে পুজা-প্যাণ্ডেলের দিকে যেতে যেতে সহসা এক কাণ্ড করে বসলেন সুভাষচন্দ্র।

সামনেই একনম্বর ওয়ার্ড। আচমকা ধাক্কা দিয়ে দীনেশকে ঐ ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে শুধু এক জনকে নিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন পুজা প্যাণ্ডেলের দিকে। ওখানে ওর পরিচিত দলের কর্মী সুনীল সেনগুপ্ত রয়েছে। এমন সুযোগ আর কখনো মিলবে না। এমন নিভৃত অবসর। কিছু বলার থাকলে এই বেলা বলে নিক।

দীর্ঘদিন বাদে পরিচত বন্ধুকে কাছে পেয়ে সেদিন সে কি আনন্দ দীনেশের।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! অবারিত মুক্তি। সাময়িক ভাবে হলেও

ঐ কনডেমণ্ড সেলের বাহিরে এসে আবার যে তিনি বন্দী সহকর্মীদের সংগে কোনদিন এমনি করে মিলতে পারবেন, তা বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আনন্দে, আবেগে সুনীলবাবুকে জড়িয়ে ধরে একটি কথাই তিনি বলতে লাগলেন বারবার,—বড়দাকে বলবেন; আমি ঠিক আছি। আমার জীবনের জীবন্ত আদর্শ,—বাদল আর বিনয়দা। সে আদর্শ আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখব।'

বড়দা হলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। মুখে অহিংসার ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন কথা নেই।

অথচ আসলে উনিশশো ত্রিশ-থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত যে দুরন্ত শক্তি শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎটাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, এই শান্তশিষ্ট, নির্বিরোধী মানুষটিই ছিলেন সেই বৈপ্লবিক সংস্থা 'বি. ভি'-র সর্বাধিনায়ক।

পুলিস তো দূরের কথা, দলের বিশেষ দু-চারজন কর্মী ছাড়া কারোরই সে-কথা জানবার সুযোগ ছিল না। এমনি কঠোর ছিল দলের মন্ত্রগুপ্তি।

হেমদা আজো বেঁচে আছেন মল্লিকা।

কোন কিছুই তিনি ভোলেন নি। অতীতের সেই কথা। মনের পাতা ওল্টাতে গিয়ে আজো ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে অতীতের সেই ধূসর পাণ্ডুলিপি। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

দিনের পরে রাত্রি। আবার রাত্রি এক সময়ে হারিয়ে যায় নূতন দিনের সমারোহে।

আবার একদিন নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন রামকৃষ্ণ।

সহসা সেদিন তিনি ঠক্ ঠক্ করে সাঙ্কেতিক ভাষায় জানালেন, শুনতে পাচ্ছেন দীনেশদা ? আমি রামকৃষ্ণ বলছি।

—হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। সাড়া দিলেন দীনেশ, কি ব্যাপার ?

—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। ওয়ার্ডার জানালে,- আমার বোন অমিতা দাশ নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অথচ মজা এই যে, এ নামে বোন তো দূরের কথা, কাউকেই আমি চিনিনে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে। পুলিশের কোন চাল নয় তো ?

—আগে থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়। ভাল করে সব লক্ষ্য কর। তবে চট করে মুখ খুল না যেন।

কিছুক্ষণ বাদেই আবার সেই সিগন্যাল, ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্। শুনতে পাচ্ছেন দীনেশদা ?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার ? কি দেখলে বল ?

—ছাই-চাপা আগুন !

—বল কি ! তোমর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ?

—ঠিক বোঝা গেল না। মনে হয় আস্তে আস্তে সব বোঝা যাবে।

অমিতা দাশকে তুমি নিশ্চয়ই চিনতে পারনি মল্লিকা ?

শুধু তুমি কেন, কেউ পারেনি। পুলিশও পারেনি।

পারলে বোধহয় সেই মুহূর্তেই তারা আতঙ্কে শিউরে উঠত।

এই অমিতা দাশই হলেন পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের স্বার্থক অধিনায়িকা, শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দার। সেদিন এই পরিচয়েই তিনি এসে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

একবার নয়, অসংখ্যবার। পুলিশ তা জানতে পেরেছিল অনেক পরে। তখন সব শেষ।

বারান্তরে তোমাকে সে কাহিনী শোনাব।

অবশেষে একদিন বিচারপতি গার্লিক তার রায় জানালেন।

মামলার ফলাফল যে কি দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে অবশ্য কারোরই কোন সন্দেহ ছিল না তবু সেদিন প্রতিটি বাঙালী, প্রতিটি মানুষের একমাত্র কামনা ছিল, দীনেশকে যেন চরম সাজা না দেয়া হয়। বোধহয় এর চাইতে বড় কাম্য সেদিনের মানুষের কাছে আর কিছুই ছিল না।

দেশবাসীর আকুল আবেদনে কোন কানই দিলেন না ইংরেজ সরকার। সুতরাং, সাজা হল-প্রাণদণ্ড। এবার প্রিভিকাউন্সিল থেকে হুকুমটা পেলেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল গোটা বাংলাদেশে। দুরন্ত ঝড়।

এ আদেশ আমরা মানব না। দীনেশ আমাদের জাতীয় বীর। তার প্রতি এই অন্যায় আদেশ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

জাতির ভাষা রূপ পেল বিপ্লবী নায়িকা বিমলপ্রতিভা দেবীর কণ্ঠে।

পার্কে-পার্কে, সভায়-সমিতিতে, মনুমেণ্টের তলায় প্রকাশ্যেই তিনি আহ্বান জানালেন তরুণ সমাজকে—'বাংলার তরুণ, ভারতের তরুণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হস্তে তোমাদের মজ্জার মজ্জা, রক্তের রক্ত ঐ বীর সাধকের মৃত্যু তোমরা ক্লীবের মত সহ্য করো না। দুর্বার কণ্ঠে জানাও যে, দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা সহ্য করব না। দীনেশ দীর্ঘজীবী হোক'।

সাড়া দিল গোটা বাংলাদেশ। সাড়া দিল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ। আমরা সহ্য করব না। দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

বিশেষ ভাবে সাড়া দিল দীনেশের নিজের হাতে গড়া মেদিনীপুর।

তাদের সাফ জবাব, আমরা বদ্‌লা নেব। একেবারে ঝাড়ে বংশে নিশ্চিন্ত করে দেব ঐ রক্ত-চোষা জাতকে।

দীনেশ নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। সেলের নির্জন কক্ষে অধিকাংশ সময়ই তার কাটতে লাগল গীতা আর রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে।

শুধু পড়া আর পড়া। দুদিন বাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তার আগে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। ইচ্ছা করেই তখন সে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় বাইরের দিকে। পাঁচিল পেরিয়ে আকাশের দূর দিগন্তে।

আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা। শেষ বিদায়ের আগে কয়েকটা অলস মন্থর দিন। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

সহসা দীনেশের ছক-বাঁকা জীবনে এল এক আকস্মিকতার চমক।

মারাত্মক খবর এসেছে মেদিনীপুর থেকে। ৭ই এপ্রিল অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত পেডি খতম্! আততায়ীর কোন সন্ধান নেই।

খবর শুনে দীনেশ আত্মহারা। তার নিজের হাতে গড়া মেদিনীপুর এবার জবাব দিয়েছে। উপযুক্ত জবাব। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই তার।

পরবর্তীকালে মেদিনীপুর আরো অনেক জবাবই দিয়েছিল মল্লিকা। রক্তে রক্তে গোটা মেদিনীপুরের মাটিই বুঝি সেদিন ওরা ভিজিয়ে দিয়েছিল এমনি করে।

দুর্ভাগ্য, দীনেশ তা দেখে যেতে পারেননি। পারলে, সেদিন তার চাইতে বেশি খুশি বুঝি কেউ হত না।

দিন এগিয়ে চলেছে।

দীনেশ তেমনিই নির্বিকার। আর দু-দিন বাদেই তাঁর ফাঁসি। দীনেশ নিজেও জানেন সে কথা।

কিন্তু তখনো তার সেই একই চেহারা। দিক না ফাঁসি। বয়েই গেল। সময় হলে দিব্বি মজা করে চলে যাব। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক তখনই।

সহকর্মী সুনীল সেনগুপ্তও সেদিনও বন্দীজীবন যাপন করছিলেন জেলের একনম্বর ওয়ার্ডে।

হঠাৎ কি দেখে সুনীলবাবু সেদিন চমকে উঠলেন দারুণ ভাবে।

দীনেশের চিঠি। ওয়ার্ডারের সাহায্যে দীনেশ গোপনে ছোট্ট একটি চিঠি পাঠিয়েছেন তার কাছে।

কিন্তু কি লিখেছেন দীনেশ তার চিঠিতে?

না, নিজের কোন কথা নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারো কথা নয়। ইহকাল বা পরকাল সম্বন্ধে কোন তত্বকথাও নয়। লিখেছেন ছোট্ট একটি কথা: একটু লুচি মাংস খাওয়াতে পারেন?'

ভাবতে পার! মৃত্যু সম্বন্ধে কতখানি নির্বিকার হলে ফাঁসির দুদিন পূর্বে এমন চিঠি লেখা সম্ভব, চিন্তা করতে পার একবার!

মৃত্যুকে এমন করে ব্যঙ্গ করার মত দুঃসাহস এর আগে কোথাও দেখেছ কি কোনদিন? শুনেছ কোথাও?

বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়া তাদের সহজাত ধর্ম নয়। তবু দীনেশের সেই চিঠিটা পড়তে পড়তে অজ্ঞাতেই কখন চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল সুনীলবাবুর।

দীনেশ লুচি-মাংস খেতে চেয়েছেন। কি করে তা সম্ভব? তিনি

নিজেই যে একজন আটক বন্দী। ইচ্ছা থাকলেই বা বন্দী-জীবনে সে সাধ্য কোথায় ?

এগিয়ে এল বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি। দু চোখে তার সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

কি হয়েছে স্বদেশীবাবুর। মনে হয় কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তার ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও তার আলোড়নটা যেন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অব্যক্ত বোবা আলোড়ন।

সব কথাই খুলে বললেন সুনীলবাবু। বন্দী-জীবনের পরম বন্ধু মতিকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই।

একটা অসহায় বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মতি। মনে মনে কি যেন চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় একসময়ে

—লুচির ভার আমি নিলাম বাবু।

—তুমি! সুনীলবাবু অবাক, তুমি এখানে লুচি পাবে কোথায় ?

—সে-সব আমি বুঝব।. মতি নির্বিকার, আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে জেল ক্যান্টিনের সবাই আমাকে একটু ভক্তি-ছেদ্দা করে। না দিয়ে যাবে কোথায়! জান লিয়ে লিবো না! কিন্তু মাংস! মাংসের কি হবে! ওখানে তো আমার কোন হাত নেই বাবু।

ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কি করা যায় এখন।

লুচিত জন্য ভাবনা নেই। মতি যখন কথা দিয়েছে, তখন যে করে হোক কথা সে রাখবেই।

কিন্তু মাংসের কি হবে ? কোথায় পাওয়া যাবে এখন মাংস ?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

এবার কিছুক্ষণের জন্য বন্দীদের ছেড়ে যাওয়া হবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ না থাকলে এসময়ে একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও তেমন কোন বাধা নেই।

অবশ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা বাদে। তাদের একমাত্র স্থান সেই কনডেম্‌ড্‌ সেল। মৃত্যুর পূর্বে কোনরকমেই তাদের বাইরে আসার উপায় নেই।

আস্তে আস্তে সুনীলবাবু একসময়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরের সেই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। মাথায় রাশি রাশি চিন্তার বোঝা। কি করা যায় এখন। কোথায় পাওয়া যাবে এখন মাংস।

হঠাৎ কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুনীলবাবুর। পাঁচিলের ধারে কি ওগুলো!

মুরগী! মুরগী! মুরগী! জেলেরই একপাল পোষা মুরগী।

ওখান থেকে একটাকে ধরে মতির সাহায্যে ক্যান্টিন থেকে ব্যবস্থা করা যায় না?

মুহূর্তে মনস্থির করে সারা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে এবার গুটি গুটি পায়ে এগুতে লাগলেন সুনীলবাবু।

দীনেশ মাংস খেতে চেয়েছেন। যে করে হোক, কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে এ দুঃখ যে জীবনেও যাবে না কোনদিন।

—ওটা কি হচ্ছে মশাই?

কে! গলা শুনেই থমকে দাঁড়ালেন সুনীলবাবু। সামনেই দাঁড়িয়ে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডের ব্যানার্জীবাবু। না, আর হল না।

ব্যানার্জীবাবু কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন অন্য কারণে। রাজনীতি সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। বোধহয় তারই জন্য তাকে রাখা হয়েছিল ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে—যেখানে আইন-কানুনের ততটা কড়াকড়ি নেই। সুখসুবিধাও অনেক বেশী।

ওদিকে যাচ্ছিলেন কোথায় অমন করে? প্রশ্ন করলেন ব্যানার্জীবাবু।

—না না, কিছু না। নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন সুনীলবাবু, এমনিই যাচ্ছিলাম ওদিকে।

—উঁহু কিছু আপনার কারণ আছে নিশ্চয়। সব কথা খুলে বলুন। ভয় নেই, আমার দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না আপনার।

রুদ্ধস্বরে সব কথাই খুলে বললেন সুনীলবাবু।

মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ কিই বা এমন চেয়েছেন আমাদের কাছে। তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছাটুকুও কি আমরা পূরণ করতে পারব না। আপনিও তো মানুষ। বলুন আপনি হলে কি করতেন এ অবস্থায়! চুপ করে থাকবেন না। বলুন।

নিশ্চল পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যানার্জীবাবু। তারপর ভাবাবেগে বললেন।

—আপনি আপনার ওয়ার্ডে ফিরে যান সুনীলবাবু। সব দায়িত্ব আমার। যে করে হোক আমি আমাদের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড থেকে কিছু মাংস আপনার কাছে পৌঁছে দেব। বাদবাকী দায়িত্ব আপনার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কথা আমি রাখব।

ব্যানার্জীবাবু সত্যিই সেদিন তাঁর কথা রেখেছিলেন মল্লিকা। প্রতিশ্রুতি মত যথাসময়েই তিনি সেই মাংস পৌঁছে দিয়েছিলেন সুনীলবাবুর কাছে।

কিন্তু সুনীলবাবু! একবারও কি তিনি ঘুমোতে পেরেছিলেন সেই রাত্রে!

না, পারেননি। বার বার চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে উঠেছিল সেই একটাই মাত্র ছবি?

দীনেশ! দীনেশ! দীনেশ! দীনেশ খেতে ভালবাসে। নিজে থেকেই তিনি আগ্রহ করে লুচি-মাংস খেতে চেয়েছেন তার কাছে। খাও বন্ধু খাও। আমি যে হাত-পা বাঁধা এক অসহায়, আটক বন্দী। ইচ্ছা থাকলেই বা আজ তোমাকে এর চাইতে বেশী কিছু দেবার মত সাধ্য আমার নেই।

আর মতি! বিশ বছরের কারাদণ্ডে সবার উপেক্ষিত খুনী মতির চোখেই কি ঘুম ছিল সে রাত্রে। তোমার কি মনে হয় মল্লিকা।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। অবশেষে এল সেই ১৯৩১ সনের ৬ই জুলাই।

সকাল থেকে আলিপুর জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব! প্রিভি-কাউন্সিল দীনেশের দণ্ডাজ্ঞা বহাল রেখেছে। কাল ভোরে তাঁর ফাঁসী। উপর থেকে নির্দেশ এসে গেছে। আর দেরী নেই। কালই।

প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতে মোম মাখানো হয়ে গেছে। সমান ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন অপেক্ষা মাত্র।

দীনেশ তেমনি নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। মৃত্যুকে তিনি 'মিত্র' রূপেই দেখে এসেছেন বরাবর, তাই এসব উদ্যোগ-আয়োজন তাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লালে লাল। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তখন একফালি রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়েছে কনডেমণ্ড সেলের অভ্যন্তরে।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা দীনেশের সারা মন ভরে উঠল এক অপার্থিব আনন্দের হিল্লোলে। রশ্মিটুকু গায়ে মেখে নিয়ে তারপরই তিনি সুর তুললেন তন্ময় হয়ে—

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণদোলা—
লাগিয়ে দিয়ে।'

দেখতে দেখতে এক সময়ে শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। কিন্তু তার রেশ জেগে রইল বহুক্ষণ পর্যন্ত।

'হে অস্তগামী দিবাকর, তোমাকে শেষ প্রণাম জানাই। সব যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। সবই চলবে পৃথিবীর অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু আমিই থাকব না।'

কোন দুঃখ নেই তার জন্য। কোন ক্ষোভ নেই। চাইবারও কিছু নেই। শুধু তোমার ঐ শেষ রশ্মিটুকু আমার সর্বাঙ্গে আরো নিবিড় করে বুলিয়ে দিয়ে যাও। যাবার আগে এইটুকুই শুধু আমার শেষ মিনতি।

শব্দহীন মন্থরতায় এমনি করে কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

সহসা কি ভেবে একতাড়া চিঠির কাগজ টেনে নিলেন দীনেশ। মাকে চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে বৌদি, মণিদি, খুকুদি প্রভৃতি সবাইকে। আর কতক্ষণই বা। সময় যে ঘনিয়ে এল।

জেল থেকে লেখা দীনেশের সেই চিঠিগুলো আজো বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে মল্লিকা।

তখনকার দিনে 'বেণু' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠিগুলো পড়ে সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাংলার বিদ্বজ্জন মণ্ডলী। মাত্র বিশ বছরের একটি যুবকের পক্ষে এতটা পরিণতি কি করে সম্ভব! এ যে অবিশ্বাস্য!

শুধু তাই নয়, মনে রেখো, এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে সেদিন অনেক জলই ঝরেছিল একটি মানুষের দুচোখ দিয়ে। পড়া শেষ করে

রুদ্ধস্বরে মাত্র একটি কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'এ তো চিঠি নয়, এ যে মূল্যবান জীবনদর্শন।'

মানুষটি কে জানো মল্লিকা? তিনি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

চিঠিগুলো তুমি মন দিয়ে শোন। বার বার শোন।

শুনে বিচার কর। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন কর যে,—সেদিন পরাধীন দেশের বিশ বছরের একটি ছেলে তার চিন্তাধারার মধ্যে যে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছিলেন, আজকের এই স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তার সামান্য ছিটে-ফোঁটাও কোথাও আশা করা যায় কি?

যাক, চিঠিগুলো হুবহু আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি মল্লিকা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা
২-২-৩১, (রবিবার)।

স্নেহের বেণ্টু ভাই,

···কিছুদিন আগে একটা গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে—

'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে ॥
কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন-মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥

শীতের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিনও ফুরিয়ে এল। আমায় ভুলো না ভাই। শীতের পুনরাগমনের সঙ্গে আমিও আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব। উত্তুরে বাতাসের পরশ পেলে মনে কোর, আমি এসেছি তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে। ইতি—

—দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা
২৯, ৩, ৩১, রবিবার।

শ্রীচরণেষু,

বৌদি গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমার ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ-জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে।

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদিরূপে পাইলাম, সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশবৎসর বয়স হইতে এই বিশবছর বয়স পর্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচাররূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখ ভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসাদ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয়, তবে তোমারকি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক, ভগবান জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি! তবে আমরা মনে হয় মরণকে আমরা বড় ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে

'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়।' গীতা বলিয়াছেন'—শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বব্যাপী।

তুমি বলিবে, এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না। মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। আমরা যতই জপ-তপ করি না কেন, যতই ফোঁটা তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল বাংলার নিমাই প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—আর আমাদেরই দেশের সে সব ছেলেরা, যারা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সঙ্গীটি (পাশের সেলের রামকৃষ্ণ) এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ বিসুখ আর নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। ইতি—

—স্নেহের ঠাকুরপো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা

মণিদি,

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বলেছিলাম রবিবারেই আপনার চিঠির জবাব দেব, কিন্তু দু'দিন পেছিয়ে পড়লাম, যদিও এতে আমার দোষ বিশেষ কিছুই নেই।

নতুন বছর শুরু হয়েছে, 'আটত্রিশ সনের ভেতর' সাঁইত্রিশ সন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নতুনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। নিরন্তর ভগবানের চিরনবীন সত্যমূর্তি এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো; এখানে বুড়োরা সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে দিয়েছে। গদী তো ছাড়বেই না, বরং সময় অসময় চোখ রাঙ্গাবে আর এঁড়ে গলায় চিৎকার করে একথাই জানিয়ে দেবে যে বুড়ো হয়ে চোখ কান আর আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্যন্ত কেহই কোন কার্যের যোগ্য হয় না। আমাদের দেশে তরুণেরাও সাপের মাথায় ধুলো পড়ার এসব কথা শুনে নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এটা তারা কিছুতেই বুঝবে না যে, বৃদ্ধ ও তরুণের মত ও পথ চিরকাল ভিন্ন। এদের এক করতে গেলে তরুণকে বৃদ্ধ হতে হবে, নয়তো বৃদ্ধকে তরুণ হতে হবে। এদেশে তরুণই বৃদ্ধ হয়। ভালবাসা জানবেন।

—স্নেহের দীনেশ।

—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।
১-৬-৩১

বৌদি,

৩০শে তারিখ তোমার পত্র পাইলাম। তোমাদের বিরাট দল যে বিপদ না ঘটাইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিয়াছে এ-কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

তোমরা আমার মায়া কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না জানি। তোমাদিগকে কোন কথা বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই। কারণ মায়ার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া কোন যুক্তিই তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিন্তু একটা কথা বলি। যে ভগবানের পূজা-অর্চনা আমাদের প্রত্যেক গৃহে গৃহে প্রতিনিয়ত হইতেছে, তাঁহাকেএকটুও বিশ্বাস করিব না কি? তাহা হইলে পূজা দিয়াই বা কি লাভ, আর তাঁহার জন্য অর্ঘ রচনা করিবারই বা কি সার্থকতা?

ভগবান মঙ্গলময়। বিপদের সময়ই যদি এ-কথাটা ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে? যাহাতে আমরা অমঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাই না, তাহার ভিতর দিয়াও ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতেছে। অজ্ঞান আমরা, তাই চোখ থাকিতেও এটা দেখিতে পাই না।

মানি, যে তোমার একান্ত আপনজন—যাকে তার ১০ বৎসর বয়স হইতে এতখানি ভালবাসিয়া আসিয়াছ,—তাকে শত যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও ছাড়িয়া দিতে মন চায় না। কিন্তু মনের মধ্যে এটা দৈন্য, মহত্ব নয়। দীনতা ত্যাগ করিয়া 'দীনেশ' কে ত্যাগ করিতে পারিবে না কি?

—স্নেহের ঠাকুরপো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা
১৭-৬-৩১

শ্রীচরণেষু,

...মাগো, তুমি আমার মমতা ছাড়। দিবানিশি আমার কথা ভাবিও না। আমি তোমার শত্রু,—বৃথা আমার কথা ভাবিয়া তোমার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট করিও না।

কে বা কার? সমস্তই মায়া। তাঁকে কায়মনোবাক্যে ডাক, তিনি মায়ার জাল ছিন্ন করিয়া তোমাকে শান্তি দিবেন। সংসারের পাঁকে পুত্র-কলত্র লইয়া যতই জড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, ততই অশান্তি। সংসারে থাকিয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছ, এখন সব ছাড়িয়া শান্তিময়কে পাইবে।

শান্তিময়কে ডাকিতে চেষ্টা কর। মনে করিও তোমার এক পুত্রের পরিবর্তে ভারতের সমস্ত ছেলেকে তুমি পুত্ররূপে পাইয়াছ। তুমি তাদের সকলের মা। তুমি তাদের সকলকে তোমার 'নসু'র মত ভালবাস।

আপন হৃদয়কে যদি বিস্তার করিতে পার, তবে শান্তি পাইবে। ভালবাস দুঃখী, কাঙাল, অনাথ, আতুরকে। আপন সন্তানের মত ভালবাস। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডির বাইরে ভালবাসা বিলাইয়া দাও, অপার আনন্দ পাইবে।

—তোমার নসু।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
১৮ই জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারও জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পাবে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত—'কেন ডাকাইছ আমার মোহন ঢুলি?' যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আফসোস করিবার কি আছে?

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিতে হইলেই আত্মার অবিনশ্বরতা বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ—দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু—হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মও বলে, মানুষ যখন মরে তখন খোদার ফেরেস্তা তার রুকবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, 'অ্যায় রুহ্ নিকল্ ইস্ কালিব্ সে চল্ খুদাকা জান্নৎ মে!' অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে।

খৃষ্টান ধর্ম বলে, 'ভেরী কুইক্‌লি দেয়ার উইল বি অ্যান এণ্ড অফ দী হিয়ার, কনসিডার হোয়াট উইল বি কাম অফ দী ইন দি নেক্সট্‌ ওয়ার্ল্ড"—অর্থাৎ দিন তো তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল খৃষ্টান ধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া ওঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন? বলি ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায়? সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন। যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?

যে দেশকে ইহজন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যার ধুলিকণাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তার সম্বন্ধে এসব কথা বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি। ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

—স্নেহের ছোট ঠাকুরপো।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা।

১৯. ৬. ৩১

স্নেহের বোন পুঁটু,

হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। চিঠিও লিখতে ইচ্ছা হল। তুমি বোধ হয় নিবেদিতার নাম শুনেছ। তাঁর জীবনচরিতখানা যোগাড় করে পড়বে। দেখবে, তিনি দুঃখী-প্রপীড়িতের জন্য নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন—পূজার ফুল যেমন করে ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করে। অপবিত্র হলে পূজোর ফুল দিয়ে যেমন পূজো হয় না, তেমনি অপবিত্র দেহ নিয়ে নারায়ণের সেবা করা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা তাই নিজেকে রেখেছিলেন অনাঘ্রাত পুষ্পের মতই পবিত্র ও নির্মল।

মেয়ে পুরুষ যে-কোন বড় কাজ করতে চাক না কেন, পবিত্রতার সাধনা ভিন্ন তা অসম্ভব। পবিত্রতার দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে দুদিন পরে সব কল্পনা তাসের ঘরের মত উড়ে যায়। দেখ না, কত লোকে কত বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলা সব ঢু-ঢু। কেন-এমন হয় জান? পবিত্রতার, আত্মার নির্মলতার অভাব।

মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য উমার তপস্যার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। এর অর্থ কি জান? কঠোর তপস্যা ভিন্ন সংযম ও পবিত্রতা অবলম্বন না করলে কেউ শ্রেয়কে লাভ করতে পারে না, সাধনায় সিদ্ধি হয় না। তেমনি তোমার জীবনের সুমুখে যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে, তবে আজ যেমন পবিত্র আছ, তেমনি চিরজীবন থাকতে হবে। আর যদি উচ্চ লক্ষ্য না থাকে তবে গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করে সংসারের তুচ্ছ সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিও ক্ষুদ্র তৃণের মত। ভাল আছি।

—নসুদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা।
৩০শে জুন, ১৯৩১

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবু তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়তো ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করিলাম, তবু তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুক-ভাঙা আর্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছায় না।

ভগবান কি আমি জানি না, তাঁর স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁর সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁর বিচার চলিতেছে। তাঁর বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিচার মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য?

যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল,—মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা।
৩০. ৬. ৩১.

খুকুদি,

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষ কোন কাজই করতে পারে না, আনন্দিত মনে যদি না সে কাজটাকে সে ভালবাসে। সংসারী ব্যক্তি সংসারের জন্য দিনরাত খেটে যাচ্ছে কেন? সংসারকে কে ভালবাসে, তাই। সন্ন্যাসী কেন দুঃখকষ্ট সহ্য করছে? সৎকে সে ভালবাসে, তাই সৎকে পাবার জন্য তার এই প্রচেষ্টা।

ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস।

যে যাকে ভালবাসে, তার জন্য প্রাণ দিতেও কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও? মানুষের বড় বড় কাজ দেখে আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকি। ভাবি, এ-কাজ সে করল কেমন করে? কিন্তু মূল খুঁজলে পাওয়া যাবে ভালবাসার প্রস্রবণ। তারই সরস রসে সিঞ্চিত হয়ে মানুষ দিতে পারে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন। কঠিন কাজ হয়ে পড়ে অতি সোজা।

ভালবাসা হিসেব জানে না। বেহিসাবে উছলে পড়াই তার স্বভাব। আপনাকে বিলিয়ে দিতে সে চায়, প্রতিদানে ভিক্ষার কণা পাবার দুর্বুদ্ধি তার নেই। তাই সে সুন্দর, অতুলনীয়। দিয়েই যায় সে, নেয় না কখনও।

আমাদের সবচেয়ে মুশকিল হল কি জান? আমাদের ভালবাসার গণ্ডী বড় সংকীর্ণ, বড়ই অল্পপরিসর। একে বড় করতে হবে। পারবে না?

ভালবাসার সাধনা করতে হয়। সার্থত্যাগ সে সাধনার প্রথম কথা। স্বার্থ আমাদের বড় জড়িয়ে ধরে, তাই কিছু করতে পারি না।

পারব, আমরা সব পারব। যার কাছে গিয়ে ভালবাসা আপন

উৎস খুঁজে পায় তিনি আমাদের হৃদয়ে উৎসারিত ভালবাসা দেবেন—সে ভালবাসা তাঁকেই উৎসর্গ করে ধন্য হয়। ভালবাসা ও প্রণাম জানাবে।

—স্নেহের নমু।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।
৩. ৭. ৩১.

মণিদি—

ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কতজনের হয় জানি না, তবে যার হয়, তার জীবন পরম স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখসম্পদ সবকিছু দেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল! সে মালা কি সহজ?

—'এ তো মালা নয় গো,
এ যে তোমার তরবারী
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রসম তারি
এ তো তোমার তরবারী।

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিত ভাবে দান করেন তিনিই। নইলে সাধ্য কি তার যে, সে গুরুভার এক মুহূর্তও সে সহ্য করে?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য আর আছে শ্রদ্ধা—

সে কি কখনও তার মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যা মোহের যে তাকে আটকে রাখবে? তার আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার অহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে, সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

আজ যাই দিদি। এই হয়তো শেষ প্রণাম।

—স্নেহের দীনেশ।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
কলিকাতা।

স্নেহের বোন প্রতিভা,

তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল কিন্তু বলা হইল না। দোষ আমার নয়। যেদিন আসিতে বলিয়াছিলাম, আস নাই। তাই আর সুযোগও হয় নাই।

জানি, অনেক বাধা বিঘ্ন তোমাকে ভাঙিয়া চলিতে হইবে; কিন্তু অর্ধেক পথে তুমি থামিয়া যাইবে না—সেই বিশ্বাসও আছে। অল্প দিনের ভিতরই তোমার সব পরিচয় আমি পাইয়াছি। এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি—ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে।

—নসু।

১৯৩১ সন। ৬ই জুলাই। দিনান্তের রঙ মুছে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। তখন দীনেশ যে চিঠি দুটো লিখেছিলেন এবার তার কথা তোমাকে বলব।

আলিপুর সেণ্টাল জেল, ৫॥ (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১. কলিকাতা।

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি নিজে তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব রাখিয়াছে, তার বুকের প্রাণসম্পদকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

—তোমার দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ৫॥ (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১.

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।

আমার যত দোষ যত অপরাধ, দয়া করিয়া ক্ষমা করিও। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু।

১৯৩১ সন। ৬ই জুলাই।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। থমথমে রাত্রি।

ঘুম নেই রামকৃষ্ণর চোখে। বারবার চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না। বার বার মনে পড়ে দীনেশদার কথা। স্বাধীনতার মূল্য দিতে গিয়ে কাল তাকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। হাজার ডাকলেও আর কোনদিন তার সাড়া মিলবে না।

অবশ্য তাকেও একদিন চলে যেতে হবে এমনি করেই। তার জন্য বিন্দুমাত্রও সে ভীত নয়। তবু এতকাল পাশাপাশি বাস। দুঃখ একটু হয় বৈকি।

একই অবস্থা চলেছে এক-তু নম্বর ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দী-মহলে। কেউ ঘুমিয়ে নেই। সবাই জেগে রয়েছে প্রচণ্ড একটা দুর্নিবার জ্বালা বুকে নিয়ে।

সহকর্মী দীনেশ। কবি, শিল্পী, লেখক, দার্শনিক দীনেশ। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতিহিংসার বলি হিসেবে শুরু না হতেই তার জীবনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল। এমনি করে আরো কতজনকে যেতে হবে, কে জানে।

তা বলে এ অন্যায় আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। সবাইকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের রক্তের বিনিময়ে। পেডি ইতিমধ্যেই গেছে। আরো অনেককেই যেতে হবে এমনি করে। কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। দীনেশের হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেবই।

পেডি গেছে। বিচারপতি গার্লিককেও শীগগীরই যেতে হবে। জেল থেকে বাইরে নির্দেশ পাঠানো হয়ে গেছে। বীর বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্য তার জন্য তৈরী হয়েই আছে।

সহসা শেষবারের মত দীনেশের দূরাগত কণ্ঠ ভেসে এল রাতের নিঃশব্দতা কাঁপিয়ে।

'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি,
রাখি না আর ঘরের দাবী,
সবার আমি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥

অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি
নিভিয়া গেল কোণের বাতি
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥'

গোটা জেলখানাতে মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধতা। সবাই নিঃশব্দ। সবাই নিশ্চুপ। নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। তবু সবার হৃদয় যেন এই মুহূর্তে একই সুরে গাঁথা হয়ে গেছে। সবাই যেন এক অকথিত ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে।

দীনেশ ঘুমিয়ে আছে। সারা মুখে তার নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। কোথাও তার মধ্যে এতটুকু মালিন্য নেই।

হঠাৎ কি শুনে ঘুম ভেঙে গেল দীনেশের। তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। স্পষ্ট তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে—গট্-গট্ গট্-গট্ গট্-গট্....

দেখতে দেখতে দীনেশের সারামুখে ফুটে উঠল একটুকরো রহস্যময় হাসি। এ সময়ে কারা যে অমন করে এগিয়ে আসছে, সে-কথা তার অজানা নয়। লগ্ন সমাগত। এবার যেতে হবে।

—গুডমর্নিং সার্জেন্ট। অগ্রগামী শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটিকে লক্ষ্য করে শুভেচ্ছা জানালেন দীনেশ, ওয়ান মিনিট প্লীজ। একটা চিঠি পেয়েছি। তার জবাবটা লিখে যেতে চাই।

তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ লিখে চললেন তার জীবনের শেষ চিঠি—

—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, কলিকাতা
৭-৭-৩১ (প্রত্যূষে)

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার ঠাকুরপো

—এই নাও। চিঠিটা সার্জেন্টের হাতে তুলে দিলেন দীনেশ, প্লীজ, এটা তুমি আফিসে জমা করে দিও। চল, এবার আমি প্রস্তুত।

যেতে যেতে কি দেখে মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন দীনেশ। পাশের সেলের গরাদে মুখ চেপে সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে রামকৃষ্ণ। সংসারে সেই বিহ্বল-করা দৃষ্টির বুঝি একটাই মাত্র অর্থ হয়।

—চলি ভাই। সহাস্যে মুখ তুলে তাকালেন দীনেশ।

—আসুন দীনেশদা। একই ভাবে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। দুচোখে তাঁর গভীর তৃষ্ণা। এই শেষ দেখা। মনের গহনে এই ছবিটাই যেন তিনি ধরে রাখতে চান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

আবার দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন দীনেশ। আর ফিরেও তাকালেন না। সৈনিককে পেছনে পানে তাকাতে নেই। তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তি তার সাজে না।

কিছুদূর গিয়েই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়াল রক্ষী-বাহিনী। সামনেই স্নানের জায়গা। বন্দীকে স্নান করানো হবে। তাই নিয়ম।

—স্নান করতে হবে বুঝি! হাসলেন দীনেশ, কি আশ্চর্য, নতুন পোশাকও রয়েছে দেখছি। ভড়ংটুকু দেখছি ঠিকই আছে। ঠিক আছে, তুমি আমার চশমাটা ধর সার্জেন্ট, আমি স্নান সেরে নিচ্ছি। না না, কাউকেই সাহায্য করতে হবে না। আমি একাই পারব।

মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে অজ্ঞাতেই কখন সূর্য্য প্রণামের শ্লোক মূর্ত হয়ে উঠল দীনেশের কণ্ঠে—

'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরম্॥'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটি। ফাঁসীর বন্দী তিনি কম দেখেননি, কিন্তু এ লোকটি যেন সবদিক থেকেই ব্যতিক্রম। যে কনডেমণ্ড সেলের নাম শুনলে পর্যন্ত কয়েদীরা ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে আধখানা হয়ে যায়, দিনের পর দিন সেখানে বাস করেও সে কত নিশ্চিন্ত, কত নির্বিকার। বরং এই ক'মাসে তার দেহের ওজন আগেকার তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত। এ বয়সে মৃত্যুকে জয় করার মত এতবড় শক্তি সে পেল কি করে?

—তোমার ভয় করে না ইয়ংম্যান? সার্জেন্টের সারা মুখে কোমল

—ভয়! হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ, কিসের ভয় আমাদের গীতায় কি বলেছে জান?

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥'

অর্থাৎ—যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। তাহলে ভয় কিসের। এ দেহ পরিত্যাগ করে আবার আমি নূতন দেহ ধারণ করে আসব। আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে! সার্জেণ্ট অবাক, কোথায় দেখা হবে?

—বোধহয় এখানেই। কে বলতে পারে, হয়তো সেদিনও তোমাকেই এই অপ্রিয় কাজটার ভার নিতে হবে।

কথাটা বলেই হেসে উঠলেন দীনেশ। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণখোলা হাসি। সে হাসিতে কোন খাদ নেই।

—যাক, আমার হয়ে গেছে। স্নানশেষে পোশাক-পরিচ্ছেদ পরে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন দীনেশ, এবার যাওয়া যেতে পারে। আমি প্রস্তুত। লেটস্ হ্যাভ আওয়ার পার্টিং কিসেস সার্জেণ্ট।

৭ই জুলাই, ১৯৩১সন।

ধীর বলিষ্ঠ পদে ফাঁসী-মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। কোন ক্ষোভ নাই। কোন শঙ্কা নেই। কোন ভয় নেই। কিসের ভয়। শহীদ প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্রের পাদস্পর্শে ধন্য এই ফাঁসী-মঞ্চ তো তার কাছে তীর্থভূমি। তাহলে ভয় কিসের!

—তোমার কিছু বলার আছে বন্দী?

—প্লীজ স্টপ। আমাদের বলার অধিকার যে কারা কেড়ে নিয়েছে,

সে কথা তো তোমরা ভাল করেই জান। তাহলে কি লাভ এসব মিথ্যে ফর্মালিটি দেখিয়ে। ডু ইওর ডিউটি। আই অ্যাম রেডি। মুখের উপর জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই দীনেশ বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'বন্দেমাতরম'।

নিমেষে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা জেলখানার উপর দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত, হাজার হাজার আটক রাজনৈতিক বন্দী ধ্বনি তুললেন—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্। শহীদ দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

তাদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল,—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ! দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে রব উঠল—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

দেখতে দেখতে বন্ধ হয়ে গেল কোর্ট-কাছারী, অফিস-আদালত, ট্রাম-বাস, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট সব কিছু। তাদের মুখেও একই কথা। একই রব। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

বিকেলে জনসমুদ্র দুলে উঠল মনুমেণ্টের নীচে। তাদের মুখেও সেই একই শপথ। দীনেশ গুপ্তকে আমরা কোনদিনই ভুলব না। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

'দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!' লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভাষা রূপ পেল ডেইলী অ্যাডভান্সের পাতায়। বড় বড় অক্ষরে সম্পাদক শিরোনামা দিলেন—'ডন্ট্‌লেস দীনেশ ডাইজ অ্যাট্‌ ডন্‌।'

আরো একধাপ এগিয়ে গেল মাসিক 'বেণু' পত্রিকা। নিমেষে তাদের হাজার হাজার কপি 'দীনেশ-সংখ্যা' কোথায় উড়ে গেল

কর্পূরের মত। ফলে রাজ রোষ। দীনেশ সংখ্যা চলবে না। ওটা বে-আইনী। অবিলম্বে ওটা বন্ধ করো।

নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতা কর্পোরেশন। সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই তারা এক প্রস্তাব পাস করলেন দীনেশ গুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাতে বলা হল—

'দিস্ কর্পোরেশন রেকর্ডস্ ইটস্ সেনস্ অফ্ গ্রিফ এ্যাট্ দি একজিকিউশন অফ্ দীনেশচন্দ্র গুপ্ত হু স্যাক্রিফাইজ্ড্ হিজ্ লাইফ্ ইন দি পারস্যুট অফ হিজ আইডিয়াল।'

(দি কর্পোরেশন অফ ক্যালকাটা, ৫ই জুলাই।)

একই দৃষ্টান্ত দেখালেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। প্রথম দিনেই তাঁরা প্রস্তাব পাস করলেন এই মর্মে—

'দ্যাট্ দিস্ মিটিং রেকর্ডস্ ইটস্ ডিপ সেনস্ অফ সরো অ্যাট্ দি ল্যামেণ্টেব্ল একজিকিউশন অফ্ শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র গুপ্ত অ্যাণ্ড হোয়াইল শেয়ারিং দি প্রোফাউণ্ড গ্রিফ উইথ্ দি মেমবার্স অফ দি বিরীভ্ড্ ফ্যামিলি প্রেজ টু দি অলমাইটি দ্যাট্ সোল অফ দি ডিপার্টেড গ্রেট মে রেস্ট্ ইন এভারলাষ্টিং পিস্।'

(দি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল অফিস, ৭ জুলাই ১৯৩১।)

আর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল :

'বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতুহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালয়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল।

মাতা পিতা স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণ মালা। মরণ মালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।...

অনেকে মনে করিয়াছিল অন্তত প্রাণ ভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন।···কিন্তু চরম দণ্ডের অন্যথা করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। অসহায় জাতি —তদপেক্ষা নিরূপায় মাতার অশ্রুসিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল।

দীনেশ বাঁচিল না। তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদক্ষিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জরপিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল, কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল; বোঝা গেল না। কেহ কি বুঝিবে?

* * *

এই সেই ঐতিহাসিক অলিন্দ মল্লিকা। এই অলিন্দেই সেদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন ওরা তিনজন।

ভাল করে তাকিয়ে দেখো। পড়তে চেষ্টা কর অদৃশ্য অক্ষরে কি লেখা রয়েছে এখানকার প্রতিটি ইঁট পাথরের গায়ে। লেখা রয়েছে:

'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

এই দেখো ওদের ছবি। ওরা তিনজন। **বিনয়-বাদল-দীনেশ।** আজ সেই ৮ই ডিসেম্বর। মাথা নোয়াও মল্লিকা। প্রণাম কর।

মনে মনে শপথ নাও। বিনয়-বাদল-দীনেশ, তোমাদের আমরা ভুলিনি, কোনদিনও ভুলবো না।

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।'

কিন্তু তোমরা ইতিহাসের নায়ক। তোমাদের মৃত্যু নেই। তোমরা অমর। মৃত্যুঞ্জয়ী।

তোমাদের শতকোটি নমস্কার।